# আজকের রাশিয়া

ডঃ দিলীপ মালাকার

গ্রন্থ প্রকাশ
১৯, শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট
কলিকাতা-১২

প্রকাশক

ময়ূখ বসু

গ্রন্থ প্রকাশ

১৯, শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট

কলিকাতা-১২

প্রথম প্রকাশ : ১৩৬৭

প্রচ্ছদ : রবীন দত্ত

মুদ্রক

শিশির কুমার সরকার

শ্যামা প্রেস

২০ বি, ভুবন সরকার লেন

কলিকাতা-৭

উৎসর্গ

কন্যা দেবাঙ্গনাকে

## ভূমিকা

"মহাত্মাগান্ধী বলেছিলেন, অন্য সকলের থেকে আলাদা হয়ে থাকব, নিজেদের চার পাশে বেড়া তুলে রাখব, এমন কথা আমি স্বপ্নেও ভাবতে পারিনা।"

"বন্ধ জানালার ঘরে আমরা এখন আর আবদ্ধ নই। বহুকালের বন্ধ জানালা এখন খুলেছে। পূব-পশ্চিমের হাওয়া খেলছে আমাদের দেশে। আগে আমরা বহু দেশকে দেখতাম খিড়কির ফাঁক দিয়ে, উন্মুক্ত জানালা দিয়ে নয়। সে সব অন্ধকার দিনের অবসান ঘটেছে।

ভূগোলের পাতায় সোভিয়েত ইউনিয়ন খুব দূরের দেশ নয়। কৃত্রিম দূরত্ব রচিত হয়েছিল আন্তর্জাতিক চক্রান্তে। রুশ বিপ্লবের পরেই সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলোর অপপ্রচারের শিকার হয়েছিলাম আমরা। বহুকাল রুশদেশ ছিল 'লৌহ যবনিকার' অন্তরালের দেশ। অনেকের কাছে ছিল নিষিদ্ধ দেশ। রকেটের যুগে গ্রহ-উপগ্রহ আর দূরের দেশ নয়। সেখানে যখন এই জগতের মানুষ বিচরণ করছে তখন কাছের দেশ সোভিয়েত ইউনিয়ন আর কতদিন দূরের দেশ, নিষিদ্ধ দেশ থাকবে। সামাজ্যবাদীদের চক্রান্ত ও অপপ্রচার ব্যর্থ করে আমাদের দুই দেশের মধ্যে প্রীতির সম্পর্ক গড়ে উঠছে।

সোভিয়েত ইউনিয়ন সম্পর্কে আমাদের কৌতূহলের অন্ত নেই। অনেকের অনেক রকম ধারণা। রক্তমাংসে গড়া মানুষদের নিয়েই সোভিয়েত ইউনিয়ন। সোভিয়েত ইউনিয়ন সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র বলে তার দেশের মানুষগুলো ভিন্ন নয়। অন্য আর পাঁচটি দেশের মানুষের মতনই রক্তমাংসের। দেশটাও মাটির। মানুষের সহজাত সব প্রবৃত্তিগুলো তাদের মধ্যে রয়েছে। অনেকে মনে করেন সমাজতান্ত্রিক দেশের মানুষগুলো ভিন্ন রকমের। এধরনের ভুল ধারণা এখনও অনেকে পোষণ করে থাকেন। ভাবলেও আশ্চর্য লাগে। একটা দেশ সম্বন্ধে অজ্ঞতাই এর প্রধান কারণ।

অনেকের ধারণা সোভিয়েত ইউনিয়ন মানে ম্যাজিকের দেশ। সমাজতন্ত্রের নামে নাকি অনেক অসম্ভবকে সম্ভব করা হয়েছে। অনেক আজগুবি খোশগল্প

শোনা যাবে সোভিয়েত ইউনিয়ন সম্পর্কে। এই অভিযোগ শুধু আমাদের এ অনগ্রসর দেশেই শোনা যাবে না। পশ্চিম ইউরোপের উন্নত দেশে আমার সুদীর্ঘ প্রবাস কালেও আমি অনেক আজগুবি গল্প শুনেছি সোভিয়েত ইউনিয়ন সম্পর্কে। আমাদের দেশে ও বিদেশে অনেককে আমি অনেক উদ্ভট মন্তব্য প্রকাশ করতে দেখেছি। সাংবাদিক হিসেবে আমি যখনই প্যারিস থেকে মস্কোর পথে রওনা হয়েছি তখনই আমার বিদেশী বন্ধুরা আমায় কত কথাই না বলেছেন। কারণ তাঁরাও হয়েছিলেন ইঙ্গ-মার্কিন সাম্রাজ্যবাদীদের শিকার। আমি যখনই সোভিয়েত ইউনিয়ন থেকে ফিরে এসে তাদের কাছে সে দেশের গল্প করেছি তখনই দেখেছি আমার বিদেশী বন্ধুদের কৌতুহল আরও বেড়ে গেছে। ফলে বেশ কয়েকজন বন্ধু সোভিয়েত ইউনিয়ন দেখতে গিয়েছিলেন। কৌতুহল আমারও কি কম ছিল? তাই আমি তিন-চারবার গেছি সোভিয়েত দেশ দেখতে। যতবারই আমি সে দেশে গেছি ততবারই আমি দেখেছি নতুনত্ব।

যে দেশে সমাজতন্ত্রবাদ চলেছে অর্ধশতাব্দীরও বেশী সময়ে, সে দেশের সমাজেও এসেছে অনেক পরিবর্তন, অনেক বিপ্লব। সে সমাজের সঙ্গে আমাদের সমাজের কোনোই মিল নেই। তা সত্ত্বেও কিন্তু মানুষের আদিম মনোবৃত্তির খুব পরিবর্তন হয় নি। মানুষ মাত্রেই ভুল-ত্রুটি, দোষ-গুণে ভরা। একথা সোভিয়েত দেশের মানুষের বেলায়ও খাটে। ওদের দোষ, ওদের গুণ সবকিছু মিলিয়েই মন্তব্য করেছি। কিন্তু সেটাও সোভিয়েত ইউনিয়নের সর্বাঙ্গীন চিত্র নয়। বরং বলব সেটা আংশিক।

সাতদিন ভ্রমণ করে বহু বিদেশী লেখক ভারতবর্ষ সম্বন্ধে বিরাট বই লিখেছেন। ভারতের চেয়ে চার-পাঁচ গুণ বড় সোভিয়েত ইউনিয়ন। সেই বিরাট দেশ দেখা কয়েক সপ্তাহে বা কয়েক মাসে সম্ভব নয়। অনেকে এই অল্প পরিসরের মধ্যে সোভিয়েত ইউনিয়ন সম্পর্কে বই লিখেছেন এবং বক্তব্য ও প্রকাশ করেছেন। যা এক রকম প্রায় অসম্ভব বলেই মনে করি।

রাশিয়া ও সোভিয়েত ইউনিয়নের মধ্যে ফারাক বিস্তর। অনেকগুলো রাষ্ট্র মিলে সোভিয়েত ইউনিয়ন। তারই একটি অঙ্গ-রাষ্ট্র রাশিয়া। আমরা কিন্তু সোভিয়েত ইউনিয়নকে রাশিয়া বলি। যদিও এটা ঠিক নয়। শুধু আমরা কেন ইঙ্গ-মার্কিনরাও চলতি কথায় রাশিয়াই বলে, সোভিয়েত ইউনিয়ন বলে না। সোভিয়েত ইউনিয়ন না বলে রাশিয়া বলার প্রধান কারণ হল,

হ্যাঁ বিপ্লবটা ঘটেছিল রাশিয়াতেই। যার নাম 'রুশ বিপ্লব'। রুশ বিপ্লবের পর জারতন্ত্রের উচ্ছেদ করে রুশরাই তাদের দেশে সমাজতন্ত্রবাদ প্রতিষ্ঠা করেছেন। রুশ বিপ্লবের আরও পাঁচ বছর পর সোভিয়েত ইউনিয়ন গঠিত হয়। রুশ বিপ্লবের সময় থেকে রাশিয়ার সমাজতান্ত্রিক সরকার বলে সবাই চিহ্নিত করত। এই কারণে আমি অনেক জায়গায় সোভিয়েত ইউনিয়ন না বলে রাশিয়া শব্দ ব্যবহার করেছি। সোভিয়েত ইউনিয়নের বদলে রাশিয়া ব্যবহার করেছি এই কারণে।

## নতুন করে দেখা

সোভিয়েত ইউনিয়নকে নতুন করে দেখলাম পাঁচ বছর পরে। সমস্ত সোভিয়েত ইউনিয়ন জুড়ে চলছে বিরাট পরিবর্তন ও আধুনিকীকরণ। বিপ্লব সেখানে থমকে দাঁড়ায় নি বলেই এই বিরাট পরিবর্তন সম্ভব হচ্ছে।

গত কয়েক বছরে পশ্চিম ইউরোপে আমি যে তারুণ্যের বিপ্লব দেখেছি, তার ঢেউ আছড়ে পড়তে দেখেছি সোভিয়েত ইউনিয়নে। এমন কি এই অর্ধমৃত ভারতবর্ষেও দেখা যাবে। সোভিয়েত ইউনিয়নের তরুণদের পোষাকে-আষাকে-আধুনিকতার যে জোয়ার এসেছে সেটি বিপ্লবের আরেকটি ধাপ বললে কোনো অন্যায় বলা হবে না। বিশ্বের সব দেশেই তরুণরাই পরিবর্তন ঘটায়। বৃদ্ধদের পক্ষে সেটা সম্ভব নয়। পশ্চিম ইউরোপের তরুণদের মতন তারুণ্যের বিপ্লবের নামে সোভিয়েত তরুণরা বিপথে যায় নি। সোভিয়েত তরুণ সমাজে ডিসিপ্লিন বজায় আছে। সোভিয়েত দেশে ও সমাজে অনেক পরিবর্তন ঘটছে সেটা আমি লক্ষ্য করছি গত দশ বছর ধরে। পাঁচ বছর পরে সেটা আরও বেশী করে চোখে পড়ল। সোভিয়েত ইউনিয়ন ভারতবর্ষের মতন স্থবীর দেশ নয় বলেই সেখানে বৈপ্লবিক পরিবর্তন ঘটেছে গত কয়েক বছরে।

আমরা বিদেশকে বিচার করি ইংরেজ-আমেরিকানদের চশমায়। আমরা ওদের উপনিবেশ ছিলাম, আমাদের চিন্তাজগতও ছিল পরাধীন, তাই ওদের দৃষ্টিভঙ্গীতে শুধু সোভিয়েত ইউনিয়ন কেন বাকি ইউরোপটাকেও আমরা ওদের দেওয়া সার্টিফিকেট দিয়ে এতকাল বিচার করেছি. এবং এখনও করছি। পঞ্চাশ বছর আগে যে দেশ সামন্ততন্ত্রের নাগপাশ কেটে বিশ্বের অন্যতম

শক্তিরূপে গণ্য হয়েছে তার দৈনন্দিন জীবনে বিলাসিতা ছিলনা বলে পশ্চিমা রাষ্ট্রগুলো বিদ্রূপ করত। এখন বিলাসদ্রব্য দেখা দিয়েছে সোভিয়েতশহরে-গ্রামে। বিলাসদ্রব্য ছিলনা বলে একদালে যারা সমালোচনা করত আবার তারাই এখন সমালোচনা করছে সোভিয়েত তরুণদের নব-সাজ ও আধুনিকীকরণে। এই সমালোচনায় যোগ দিয়েছে পশ্চিমী রাষ্ট্রগুলোর সঙ্গে চীনও। যুগ পরিবর্ত্তনের সঙ্গে যে দেশ চলে তাকেই তো বলা হয় প্রগতিশীল। সোভিয়েত ইউনিয়ন প্রগতিশীল রাষ্ট্র বলেই সেখানে আধুনিকীকরণ সম্ভব হচ্ছে।

এ যাত্রায় সোভিয়েত বিমানে আমার বিচিত্র অভিজ্ঞতালাভ হল। কলকাতা বিমানবন্দর ছাড়লাম বর্ষার এক শনিবারের রাতে। রাত তখন ন'টা, এয়ারোফ্লোট কোম্পানীর কর্মচারীরা বললেন—প্লেনে ওঠার আগে আপনাদের ব্রেকফাষ্ট দেওয়া হবে। আমি তো অবাক। এই রাত্রে ব্রেকফাষ্ট! তাহলে ডিনার হবে কখন। ব্রেকফাষ্টের পর লাঞ্চ তারপর তো ডিনার। যাইহোক দমদম বিমান বন্দরে পেটভরে ব্রেকফাষ্ট খেয়ে প্লেনে চড়লাম। বিমানটি ছিল ইল্যুশিন—১৮। বিমানটিতে কোনো ঝাঁকুনি নেই। বিমানটি আসছিল হ্যানয় থেকে। রুশ ও ভিয়েৎনামী যাত্রীতে ভর্তি। রুশরা চলেছে দেশে। স্বদেশ প্রত্যাবর্তনের হাসি সবার মুখে। বিমানের 'এয়ার হোষ্টেস'দের চেহারা গোলগাল-হাসিখুসি। এদের একজনকে জিজ্ঞাসা করলাম, পানের ব্যবস্থা আছে? নাদুস-নুদুস চেহারার এয়ার হোস্টেস আমার কথা শুনে হেসে গড়াগড়ি যায় আর কি। বললে—হুইস্কি-ভড্‌কা কিছু নেই। ঠাণ্ডা জল আর সরবৎ আছে। পরে শুনলাম সোভিয়েত বিমানে মদজাতীয় কোন পানীয় দেওয়া হয় না। অন্যসব দেশের বিমানে এসব বিক্রি করা হয়।

রাত বারোটায় বম্বেতে নেমে আমরা পান করলাম কোকা-কোলা। বম্বে ছাড়ার পর বিমানে দেওয়া হল আবার ব্রেকফাষ্ট। তারপর বিমান চলল আরব সাগরের উপকূল দিয়ে, প্রবেশ করল ইরান পেরিয়ে আফগানিস্তান, আফগানিস্তান সীমান্ত পেরুতেই এক পেল্লাই ব্রেকফাষ্ট এলো। তখন ভোর হয়ে গেছে। খেয়ে দেয়ে ক্যাশপিয়ান সাগরের দৃশ্য দেখছি, খানিকবাদে ঘোষণা করা হল, বিমান কিছুক্ষণের মধ্যেই তাশখন্দে অবতরণ করবে।

তাশখন্দে অবতরণ করে সকালের মিঠে রোদ বেশ আরামদায়ক লাগছিল। পাশপোর্ট, কাষ্টমস্ ইত্যাদির ঝামেলা মিটিয়ে আমরা বিমান বন্দরের

রেস্তোরাঁয় ঢুকলাম। সেখানে সাজানো রয়েছে ব্রেকফাষ্ট। একে বলব রাম ব্রেকফাষ্ট। মাছ-মাংস-তরকারী সবই আছে এবং দুজনের খাবার এক এক জনের পাতে। খেয়ে দেয়ে আবার বিমানে। এবার গন্তব্যস্থল মস্কো। বিমানে উঠে বসেছি, খানিক বাদেই ঘোষণা করা হল, ব্রেকফাষ্ট দেওয়া হবে, সুতরাং প্রস্তুত থাকুন। এবার এলো বিরাট ব্রেকফাষ্ট কিন্তু আসলে লাঞ্চ। অনুবাদের বিভ্রাটে এই তার হাল হয়েছে বলেই আমার ধারণা।

মস্কোর সিরিতমাভো বিমান বন্দরে নেমে মনে হল বোশেখ মাসের দিল্লী বিমান বন্দরে পৌঁছেছি। বেশ গরম কিন্তু কলকাতার মতন প্যাচ্‌প্যাচে ঘাম নেই। ইউরোপের গরমের সঙ্গে আমাদের দেশের গরমের তফাৎ অনেক। ওদের দেশে সব বছরেই গ্রীষ্মকালে সাংঘাতিক গরম পড়েনা। এবছরে যে গরম পড়েছিল সেটা ব্যতিক্রম। গ্রীষ্মকালের গরমকে তারা সাদরে আহ্বান করে আনে। কিন্তু যখন সাংঘাতিক গরম পড়ে তখন তারা প্রস্তুত থাকে না, ফলে গরমে ছট্‌ফট্‌ করলেও পাখার হাওয়া বা এয়ারকণ্ডিশনে ঠাণ্ডা হাওয়া খাওয়ার ব্যবস্থা থাকে না। মস্কো বিমান বন্দরে নেমে আমাদের সেই অসুবিধাটা ভোগ করতে হয়েছিল। ওদের ঘর গরম করার ব্যবস্থা আছে কিন্তু ঠাণ্ডা করার ব্যবস্থা নেই। তাই যত বিভ্রাট।

মস্কোর পরিচয় তার কনকনে ঠাণ্ডায়। প্রায় সারা বছরই ঠাণ্ডা যে দেশের পরিচয় সে দেশে এত গরম বিদেশীদের বিচলিত করবে তাতে বিচিত্র কি।

—রাশিয়ার কনকনে ঠাণ্ডার দাপটে নেপোলিয়ন মস্কোর দোরগোড়ায় পৌঁছেও তার সৈন্য-সামন্ত নিয়ে হটে যেতে বাধ্য হন। সেই ঠাণ্ডার শহর মস্কোয় এবার অন্য রূপ দেখলাম। মস্কোয় গ্রীষ্মের দাপটে বহু মস্কোবাসী দেশান্তরী হয়েছেন। উত্তর সাগরে বাল্টিক সমুদ্রের তীরবর্তী অঞ্চলে ল্যাটভিয়া, এস্তোনিয়া ও লিথুনিয়ায় ঠাণ্ডায় শরীর মনকে স্নিগ্ধ করতে ভীড় জমিয়েছে বহু মস্কোবাসী। গত পঞ্চাশ বছরের মধ্যে এত কষ্টকর গরম পড়েনি বলে জানিয়েছেন তাঁরা।

শুধু তাই নয়, গত এক মাসে বৃষ্টিপাত হয়নি মস্কো ও তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে। খরার প্রভাব চলছে রাশিয়ার কয়েকটি অঞ্চলে। অনেকে বলেছেন, খরায় চাষাবাদ ভাল হবে না। সেচের কাজ বন্ধ নেই, সেটা ঠিক। কিন্তু শাক-সব্জির জন্যে চাই অন্ততঃ ছিটেফোঁটা বৃষ্টি। মস্কো শহরের বাগ-বাগিচায়, রাস্তার ধারে ঘাস ও ফুলের গাছ শুকিয়ে হলদে রঙ ধরেছে। তাতে রোজ জল

দিচ্ছে কর্পোরেশনের গাড়ী। এর আগেও কয়েকবার এই সময়ে আমি এসেছি মস্কোয়। কিন্তু কখনো এমন গরম দেখিনি। এত গরমে পাখার ব্যবস্থা না থাকায় আরও কষ্টকর মনে হয়। তবে কিছু কিছু দোকানে আজকাল পাখার ব্যবস্থা হয়েছে। মস্কোর গরম কলকাতার মতন এত কষ্টকর নয়। সেখানে ঘাম মোটেই হয় না। কলকাতার সঙ্গে মস্কোর গরমের পার্থক্য এখানেই।

পাঁচ বছর পরে মস্কো শহরের অনেক পরিবর্তন দেখলাম। মস্কো শহরে ও তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে দেশলাই বাক্স প্যাটার্ণের অসংখ্য অট্টালিকা গজিয়ে উঠেছে। এখন যেসব নতুন বাড়ী নির্মিত হচ্ছে, তাতে স্তালিন আমলের স্থাপত্যশিল্পের ছোঁয়া নেই। লণ্ডন-প্যারিসের মতন গগনচুম্বি আধুনিক ধরনের বাড়ী নির্মিত হচ্ছে। নতুন আরও অনেক হোটেল হয়েছে এবং আরও চারটি পচিশতলা অট্টালিকা নির্মিত হচ্ছে। ফ্ল্যাটবাড়ীগুলোও ওই একই ধরনের।

সাধারণ মানুষের আয় বেড়েছে। তাদের বিলাসদ্রব্যের ব্যয়ের মাত্রাও বেড়েছে। মস্কো কেন, যে-কোনো শহরে গেলেই দেখা যাবে মিনি স্কার্ট, হট প্যাণ্ট, ম্যাক্সি বেল বটম ও ঢোলা প্যাণ্টের ছড়াছড়ি। লম্বা চুল ও জুলপির সংখ্যাও কম দেখিনি। আজকাল বহু পশ্চিমী খাদ্য ও পানীয় দ্রব্য মস্কোয় পাওয়া যাচ্ছে, যা দশ বছর আগে দেখা যেতো না। সব মিলিয়ে মনে হচ্ছে, এখানকার কড়াকড়ি অনেক কমেছে। উদারনৈতিক মনোভাব দেখা যাচ্ছে সর্বত্র।

দেশের জনগণের আয় বাড়ছে কি কমছে সেটা নির্ভর করে সে দেশের অর্থনৈতিক উন্নতি ও অবনতির ওপর। অর্থনৈতিক প্রশ্নটিই সেখানে প্রবল। সোভিয়েত দেশে জনগণের ক্রয় ক্ষমতা বেড়েছে, তাদের আয় বেড়েছে বলেই সেটা সম্ভব হয়েছে। সোভিয়েত ইউনিয়নের অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি ঘটেছে এটাই তার প্রমাণ।

একদিকে সমৃদ্ধি আরেক দিকে উদার নীতির ফলে সোভিয়েত ইউনিয়নের সর্বত্রই পোশাকে বিলাস এসেছে। মস্কোর রাস্তায় মিনি স্কার্ট, হট প্যাণ্ট ও তার সঙ্গে হাওয়াই চপ্পল দেখে আমি এক রুশ বন্ধুকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম, এরা কি বিজ্ঞানী?

না হে না; এরা সব রুশ ছেলে-মেয়ে। উত্তর দিলেন আমার বন্ধু ইভান।

ভারতের হাওয়াই চপ্পল দেখা যাবে আজকাল সোভিয়েতের বহু শহরে

অবশ্য গ্রীষ্মকাল বলেই দেখেছি। শীতকালে হলে দেখতে পেতাম না। আমার বন্ধু ইভানের সঙ্গে গিয়েছিলাম এস্তোনিয়ার বাল্টিক সমুদ্রের তীরে পারনু শহরে। সেখানে রঙ-বেরঙের খাটো পোষাকের ছড়াছড়ি। আমার কৌতূহলী দৃষ্টি দেখে ইভান বললে—আজকালকার ছেলে-মেয়েরা কলকারখানায়-অফিসে রোজগার করছে ভাল। ওদের রুচিও বদলেছে। তাই যত্তসব বিদঘুটে পোষাক পরে সাজছে। অবশ্য আমাদের দেশে হিপি-টিপি নেই।

রুশরা ভোজনবিলাসী জাত। আগে ওদের দেশে পোশাকে বিলাস দেখিনি কিন্তু ভোজনে দেখেছি। ওরা যেমন খেতে ভালবাসে তেমনি অতিথিদের খাওয়াতে। অনেক সময়ে খাইয়ে মারার উপক্রম করে। সে অভিজ্ঞতা আমারও আছে।

রাশিয়ানরা যেমন প্রচণ্ড খেতে পারে, তেমনি খাটতে পারে। স্বাস্থ্য ভাল বলেই ওরা প্রচণ্ড পরিশ্রম করতে পারে। বহু হোটেল-রেস্তোরাঁয় দেখা যাবে এক একটি কর্মচারী সকাল আটটা থেকে রাত এগারটা পর্যন্ত একনাগাড়ে কাজ করে চলেছে। এদের মধ্যে অধিকাংশই মহিলা। তবে যেদিন পনের ঘণ্টা কাজ করে, সেদিন তারা তিনগুণ রোজগার করে এবং পরের দিন বিশ্রাম নেয়। রুশরা পরিশ্রমী জাত, সে-বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই।

স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য সোভিয়েত সরকার সব রকমের ব্যবস্থা অবলম্বন করে থাকেন। চিকিৎসার জন্যে কারুর কোনো দুশ্চিন্তা নেই।

হাতে প্রচুর কাঁচা পয়সা আসায় কিছু লোক মদ্যপানে পয়সা নষ্ট করে স্বাস্থ্য খারাপ করছে বলে সোভিয়েত সরকার নতুন পথ ধরেছেন। যাতে মদ্যপানের মাত্রা কমে, তার জন্য মদের দাম পাঁচ গুণ বাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। রেস্তোরাঁয়-বারে মদের দাম সাতগুণ বেশী। শনি বারে অনেক দোকানে মদ বেচা বন্ধ করা হয়েছে। রেডিওতে প্রায়ই প্রচার করা হচ্ছে 'মদ্যপান কমান' ইত্যাদি। মদ্যপান কমানো হলে কারখানায় শ্রমিকরা উৎপাদন আরও বাড়াতে সক্ষম হবে বলে মনে করেন অনেকে। এটিও নতুন প্রচেষ্টা।

সোভিয়েত ইউনিয়নের কয়েকটি অঙ্গ-রাষ্ট্রের শহরে ভারতে প্রস্তুত ফলের রসের টিন দেখে অবাক। ভারতের কয়েকটি বিখ্যাত কোম্পানীর বিজ্ঞাপন সাঁটা টিনের কৌটয় আমের রস, আনারসের রস বিক্রি দেখে আমার কৌতূহল বেড়ে গেল। খোঁজ নিয়ে জানলাম আজকাল ভারত থেকে আসছে প্রচুর পরিমাণে টিন ভর্তি ফলের রস। এ সব বেশ জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে।

অনেক শহরে অনেকের পায়ে দেখেছি ভারতের প্রস্তুত জুতো। ভারতীয় হিসেবে বিদেশে ভারতীয় জিনিষের কাটতি দেখলে স্বভাবতঃই বুকটা গর্বে ফুলে ওঠে।

মস্কোর এক নৈশভোজের আসরে ভারতীয় আমের রস ও আনারসের রস নিয়ে আলোচনা চলছিল। আমার প্রশ্নের উত্তরে এক ছোকরা অফিসার বললেন—আজকাল আমের রসের জনপ্রিয়তা বেড়েছে। মেয়েরা খুব পছন্দ করে। ফ্যাসানে দাঁড়িয়ে গেছে বলা যেতে পারে।

ছোকরা অফিসারের নাম বরিস। পররাষ্ট্র দপ্তরে ভাল চাকরী করে। তারই দপ্তরের আরও কয়েকজন বয়স্ক অফিসার ছিলেন সে আসরে। বরিস দুবছর আগেও ছিল ছাত্র। উৎসাহের আতিশয্যে সে বলেই ফেললে—জানেন, আমরা আজকাল আমের রসের সঙ্গে ভড্‌কা দিয়ে একটা 'পাঞ্চ' করি। খেতে ভীষণ ভাল লাগে। বয়স্ক অফিসার ভ্লাদিমির তাকে ধমকে দিয়ে বললে—ছ্যা ছ্যা আমের রসের সঙ্গে ভড্‌কা? কোনো ভদ্রলোকে খায় মশাই। ভড্‌কা, ভড্‌কাই, তার সঙ্গে কিন্তু মিশিয়ে আমি খাইনা। কিছু মেশালেই ভড্‌কার জাত যায়। তবে শুনেছি কেউ কেউ টোমাটো জুসের সঙ্গে ভড্‌কা মিশিয়ে এক রকমের পাঞ্চ বানায়। যার নাম হয়েছে ব্লাডি মেরী। আমি মশাই এসব রসিকতার মানে বুঝি না। ছোকরা বরিস এই আলোচনায় উৎসাহ পেয়ে বলে উঠল, আমরা তো ছাত্রাবস্থায় এসব খেতাম। নির্ভেজাল ভড্‌কা খেতে ভাল কিন্তু গলা জ্বলে। তার চেয়ে ম্যাঙ্গো জুস্‌ দিয়ে মিশিয়ে খেলে আরও ভাল লাগে। ছোকরা অফিসার ও বয়স্ক অফিসারের মধ্যে তর্ক বেধে গেল আমের রস ও ভড্‌কা নিয়ে। আমি ভাবছিলাম অন্যকথা। রুশ সমাজে পরিবর্তন এসেছে। এটাই তার একটি প্রমাণ। সেকালের বয়স্কদের মনোভাবের সঙ্গে একালের যুব সমাজের মানসিকতার মধ্যে অনেক প্রভেদ। তরুণ ও যুবসমাজে শুধু পোষাক পরিবর্তন আসেনি, এসেছে জীবনের অনেক ধারায়। এসেছে খাদ্যে, এসেছে পানীয়তে। চলনে-বলনে তো বটেই।

শরীরটাকে সুস্থ রাখার জন্যে শুধু মদ্যপান কমানোই এদের একমাত্র কর্মপন্থা নয়। যাতে সবাই দৈনিক ব্যায়াম করে শরীরটাকে সুস্থ রাখে তার জন্যে অনেক ব্যবস্থা রয়েছে বিভিন্ন কারখানায়। সকাল ছটা থেকে আটটার মধ্যে রেডিও খুললেই শোনা যাবে ব্যায়াম করার বাজনা। বাজনার তালে তালে ব্যায়াম করা চলে অনায়াসে।

কলকাতার মতন পরিবহন সমস্যা নেই মস্কোয়। সেখানে কেউ ট্রামে-বাসে ঝুলে যায় না। পাতাল রেল এবং অসংখ্য বাস চলে রাত একটা পর্যন্ত। কণ্ডাকটরের বালাই নেই। বাসে উঠে পাঁচ কোপেক দিলেই হল একটি বাকসে। পাতাল রেলে তিন কোপেক একটি গর্তে দিলেই দরজা খুলে যায়। ভীড় ঠেলাঠেলি নেই। কিন্তু একটি ব্যাপারে কলকাতার কাছাকাছি যায়, সেটি হল ট্যাকসি। কলকাতার তুলনায় মস্কোর ট্যাকসির সংখ্যা কয়েক গুণ বেশী। ষোল হাজার ট্যাকসি রোজ চলে মস্কোর পথে। কিন্তু ট্যাকসি পাওয়া ভাগ্যের কথা। পাঁচ-সাত বছর আগেও যে সমস্যা দেখেছি ট্যাকসির, এখনও ঠিক তেমনি রয়েছে।

মস্কোর রাস্তায় এখন নতুন নতুন গাড়ী। ফিয়াট কোম্পানীর বড় গাড়ীর ঢঙে অধিকাংশ গাড়ী। সেকেলে ভল্গা-মস্কোভিচ গাড়ীর মডেল এখন বিলুপ্ত হচ্ছে। রাস্তাঘাট ঝকঝকে। কোথাও চন্দ্রপৃষ্ঠ নয় বলে ঘণ্টায় একশো কিলোমিটার গতিতে গাড়ী ছোটে।

মস্কোর রাস্তাঘাট আগের চেয়ে অনেক পরিষ্কার ও ঝকঝকে দেখলাম এবার।

বই-এর পাড়ায় ভীড় লেগেই আছে। আগেও দেখেছি ভীড়। বই পড়তে ভালবাসেন রুশরা। নতুন বই বেরুলেই বই কিনতে কাড়াকাড়ি পড়ে যায় সেখানে।

মস্কোর প্রগতি প্রকাশনে মিঃ ভিকেন্তি লোসকুতভের সঙ্গে আলাপ হল। মিঃ লোসকুতভ ভাল বাংলা জানেন ও বলেন। তাঁরা রুশ-বাংলা একটি নতুন অভিধান প্রকাশ করছেন। অনেকটা চলন্তিকা ধরণের হবে বইটা। ত্রিশ হাজার শব্দ থাকবে এই অভিধানে। বইটা প্রকাশিত হবে সামনের বছর।'

## সোভিয়েত ইউনিয়নের সর্ববৃহৎ ছাপাখানায়

দৈনিক প্রাবদার নাম কে না শুনেছেন। সোভিয়েত ইউনিয়নের গুরুত্বপূর্ণ ঘটনার সঙ্গে প্রাবদার নাম জড়িয়ে থাকে। লেনিন প্রতিষ্ঠিত প্রাবদার ইতিহাসের সঙ্গে সোভিয়েত ইউনিয়নের ইতিহাসও জড়িত হয়ে আছে। এক মস্কো শহরে প্রাবদার প্রচার সংখ্যা চল্লিশ পঞ্চাশ লাখ। অন্য অনেক শহরে রয়েছে অন্য সংস্করণ। তার প্রচার সংখ্যা জুড়লে আশীলাখের মত

দাঁড়ায়। যে ছাপাখানায় দৈনিক প্রাবদা ছাপা হয় সেটির নাম ১নং ছাপাখানা। এই ছাপাখানায় আরও দুটো দৈনিক বা ওইজাতীয় পত্রিকা ছাপা হয়। সেটি বেশ প্রাচীন।

প্রাবদার ২নং ছাপাখানায় কিন্তু প্রাবদা পত্রিকা ছাপা হয় না। ২নং ছাপাখানা দেখতে গিয়ে চক্ষু স্থির। আগে আমি পশ্চিম জার্মানী, ফ্রান্স ও ইতালির বহু পত্রিকার সর্ববৃহৎ ছাপাখানা দেখেছি। তার তুলনায় প্রাবদার ছাপাখানা একটি দৈত্য গোছের। প্রাবদার ২নং ছাপাখানা নবীন। রঙচঙে সাপ্তাহিক পাক্ষিক ও মাসিক পত্র-পত্রিকা ছাপা হয় দিনরাত। সোভিয়েত ইউনিয়নের যতগুলো ভাষা আছে সেগুলো ছাড়াও বিশ্বের যত রকমের ভাষা আছে তার একটা না একটা পত্রিকা ওখানে ছাপা হয়ে থাকে। এই এলাহি ব্যাপার স্বচক্ষে না দেখলে বিশ্বাস হবে না।

প্রায় আধমাইল জায়গা জুড়ে এই ছাপাখানা। ছাপাখানার বাড়িটি চার তলার। প্রত্যেক তলায় এক একটি বিভাগ। ফটো অফসেট মেশিনে ছাপার অতি আধুনিক ব্যবস্থা।

আমার কৌতূহলে ভারতীয় ভাষায় পত্রিকাগুলো ওতে কেমন করে ছাপা হয় তাই দেখতে। এক ভদ্রমহিলা লাইনোটাইপ মেশিনে বাংলা কম্পোজ করে চলেছেন। তাঁকে জিজ্ঞাসা করলাম, বাংলা জানেন। উত্তর এলো—না। আমার কৌতূহল আরও বাড়ল। খোঁজ নিয়ে জানলাম, যাঁরা ভারতীয় বা চীনা ভাষায় কম্পোজ করেন, তাঁরা মাস তিনেকের অক্ষর পরিচয়ের শিক্ষা নেন। তারপর গোটা গোটা হাতের লেখা দেখে কম্পোজ করেন আধঘণ্টায় একপাতা করে।

এরপর ফোটো প্লেটে রিটাচ্ করতে দেখলাম বাংলায় কয়েকটা জাপানী মেশিনে। সেখানেও যে সব মেয়েরা কাজ করছে তারাও কোনো ভারতীয় ভাষা জানে না।

ছাপা হচ্ছে সেখানে পূর্ব জার্মানীর প্লামাগ ও ইতালির আন্দ্রেওত্তি মেশিনে। ছাপার কাগজ এসেছে সুইডেন ও ফ্রান্স থেকে। ছাপা যাতে নিখুঁত ও মনোরম হয় তার প্রতি নজর রেখেই প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তাদের এখন প্রধান চিন্তা। সোভিয়েত ইউনিয়নে এক বগ্‌গা বা এক রোখা কোনো চিন্তা কোনো শিল্প ক্ষেত্রে জোর করে চাপানো হয় না। শিল্পোন্নয়ন ও পণ্য দ্রব্যের উৎকর্ষের দিকে যথেষ্ট দৃষ্টি দেওয়া হচ্ছে। প্রাবদার ২নং ছাপাখানাটি তার

দৃষ্টান্ত বলে মনে করি। গোটা চারেক আধমাইল লম্বা মেশিনে ছাপা হচ্ছে রঙিন পত্রিকা দিনে লাখ-লাখ। সবই যন্ত্রচালিত। ছাপা থেকে শুরু করে বাঁধাই সবই হয় যন্ত্রে। তারপরে প্যাক হয়ে চলে যাচ্ছে গুদামে। সেখানে রেলের ওয়াগন অথবা ট্রাক্ প্রস্তুত। সেখান থেকে যাবে দেশ-দেশান্তরের অভিমুখে হয় বিমান বন্দরে নয়তো রেল স্টেশনে। এতবড় ছাপাখানায় কিন্তু কর্মীর সংখ্যা কয়েকশো। কারণ অধিকাংশ কাজ হচ্ছে স্বয়ং চালিত যন্ত্রে। মস্কোয় প্রাবদার ২নং ছাপাখানাটি আমায় বিস্মিত করেছে। এই ছাপাখানায় যিনিই আসবেন তাঁকেও সমানভাবে বিস্মিত হতে হবে বলেই আমি মনে করি।

## মস্কো জয়ের কাহিনী

আমায় মুগ্ধ করেছে মস্কোর প্যানারামা মিউজিয়মটি। কুতুজভস্কায় রাস্তার ধারেই মিউজিয়ম। নেপোলিয়ন যখন মস্কো আক্রমণ করতে এগিয়ে যান তখন মস্কো এলাকার রুশ প্রধান সেনাপতি ঠিক এই জায়গায় একটি চাষীর কুঁড়ে ঘরে বসে পরামর্শ করতেন তাঁর সহকর্মীদের সঙ্গে। প্রধান সেনাপতি কুতুজভের নামে এই রাস্তার নাম। প্যানারোমা মিউজিয়মটি নির্মিত হয়েছে সেই ছোট কাঠের বাড়ীর পাশেই। কাঠের বাড়ীতে রাখা হয়েছে কুতুজভের ব্যবহৃত কিছু জিনিসপত্র।

নেপোলিয়ন তখন মস্কোর বারো মাইল দূরে। রুশ বাহিনী তার সম্মুখে। সেনাপতি কুতুজভের দূরদর্শিতায় নেপোলিয়নকে মস্কো জয়ের আশা ত্যাগ করে ব্যর্থ মনোরথে হটে যেতে হয়েছিল। কেমন করে এই লড়াই হয়েছিল। তারই সচিত্র বিবরনী এমন নিখুঁত ভাবে দেওয়া আছে যা দেখে মনে হবে যেন আমিই সেখানে দাঁড়িয়ে নেপোলিয়নের লড়াই দেখছি। বিরাটাকার গোল ঘরের দেয়ালে চিত্র, যুদ্ধের বাড়ী ঘরগুলো যেভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল ঠিক তেমনি ভাবে সাজান হয়েছে সত্যিকারের বাড়ী ঘর। এক একটি রণক্ষেত্রের ছবি এমনভাবে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে যেন মনে হবে ওটাই রণক্ষেত্র। তার ওপর গাইড বুঝিয়ে দেবে প্রতিটি রণক্ষেত্রের ঐতিহাসিক গুরুত্ব। ছাত্র-যুবা বৃদ্ধ সবাই শুনেছে মন দিয়ে।

রাশিয়ার নেপোলিয়নী যুদ্ধের যত রকম ঐতিহাসিক জিনিষ তাঁরা সংগ্রহ করতে পেরেছেন তার বহু জিনিষ সেখানে প্রদর্শিত হচ্ছে।

সোভিয়েত ইউনিয়নের বহু রাজ্য থেকে দলে দলে লোক আসছেন প্যানারামা মিউজিয়ম দেখতে। এমনি কোনো মিউজিয়ম কি হতে পারে না আমাদের দেশে। যে মিউজিয়মে দেখানো হতে পারে আমাদের স্বাধীনতার লড়াই।

মস্কোর প্যানারামা মিউজিয়মটি দেখার এক গোপন ইতিহাস রয়েছে। আমাকে এই মিউজিয়ম দেখাতে এনেছিলেন বন্ধুবর ইগর। তাঁর সঙ্গে বেশ কয়েকদিন ধরে ঘুরে বেড়িয়েছি বাল্টিক সমুদ্রের তীরে এস্তোনিয়ায়। এস্তোনিয়া সফর শেষ হয়েছে, মস্কোর জন্যে প্রস্তুত হচ্ছি। এমন সময় ইগর জিজ্ঞাসা করলে, এস্তোনিয়া কেমন লাগল ?

উত্তর দিই—খুব ভাল লেগেছে।

সে বললে—এবার তোমার প্রোগ্রাম কি ?

আমি বলি—মস্কো জয়।

তার মানে ?

তার মানে, মস্কো জয় করব।

শুধু ইগর নয় যে কোনো রাশিয়ানকে মস্কো সম্বন্ধে কিছু বললেই হল আর কোনো কথা নয়। রুশরা তার দেশকে তো ভালবাসেই তার চেয়েও বোধ হয় বেশী ভালবাসে তাদের মস্কোকে। তাই বহু রুশ গায়ক মস্কোর গান গেয়ে বিখ্যাত হয়েছেন।

ইগারকে আমি উস্কে দিই, মস্কো জয় করব বলে। ইগর বলে—জান, নেপোলিয়ন কোনোদিন মস্কো জয় করতে পারে নি, তুমি কোথাকার এক নিধিরাম সর্দার এলে ঢাল নেই তরোয়াল নেই। বললেই হল। মস্কো জয় কি অতই সোজা।

আমি বললাম, হ্যাঁ আমি পারব। আমার একটি অস্ত্র আছে।

সে তো অবাক, সে আবার কোন অস্ত্র ?

উত্তরে বলি—হৃদয় অস্ত্র। হৃদয় দিয়ে মস্কো জয় করব। ইগারের মাথায় কিছুতেই ঢুকছে না যে একটা শহরকে জয় করা যায় কি করে। তাও আবার হৃদয় দিয়ে। অতসব হেঁয়ালির কথা তার মাথায় ঢুকতে চায়'না। মস্কোর পথে সে গজ্ গজ্ করে চলল। মস্কো এসেই সে প্যানারোমা দেখাবার ব্যবস্থা

করে ফেললে। আমাকে বোঝাতে লাগল মস্কো জয় অত সোজা নয়।

মস্কোর অন্য বন্ধুদের মস্কো জয়ের কথা বলতে তাদের অনেকে হেসে খুন হয়েছিলেন। কিন্তু কয়েক জনকে দেখলাম মুখ ভার। অনেকে মস্কোকে এত ভালবাসে যা সাধারণ রসিকতাটুকু বুঝতে চায় না। আমার এক বন্ধু বললেন—অমন বদ রসিকতা আর কোরো না।

যাইহোক প্যানারোমা মিউজিয়ম নেপোলিয়নের মস্কো জয়ের স্বপ্ন ব্যর্থ হয়েছিল কি ভাবে সে সব দেখে ফিরছি, ইগর এসে বললে, সাধ মিটেছে মস্কো জয়ের ?

আমি বললাম—এই তিন দিনে মস্কোর অর্ধেক জয় করে ফেলেছি। বাকি তিন দিনে পুরোটা জয় করব। আমার হৃদয়ের জোর তোমার চেয়ে অনেক বেশী। তুমি কি পারবে আমার কলকাতা জয় করতে ? কিছুতেই না। এবার ওর মাথায় ঢুকল, এটা রসিকতা। সত্যিকারের যুদ্ধ জয় নয়।

মস্কো শহরে অভিজাত পাড়া বলে চিহ্নিত কোনো পাড়া নেই। তবে বিদেশী দূতাবাসের কর্মচারীদের জন্যে একটি পাড়ায় বেশ কিছু ফ্ল্যাটে ছিল সান্ধ্য নিমন্ত্রণ। যে বন্ধুটি নিমন্ত্রণ করেছিলেন, তাঁর ফ্ল্যাটে গিয়ে দেখি জমজমাট। খানা-পিনা সুরু হয়ে গেছে তখন। মধ্য বয়সী এক রুশ ভদ্রমহিলা আমাকে দোভাষীর কাজ করতে অনুরোধ করলেন। ভদ্রমহিলার নাম বললেন তামরা। ফরাসী বলেন ভালই। সুতরাং তাঁর অনুরোধ রক্ষা করতে হল। কোনো কূটনৈতিক আলোচনায় অংশ গ্রহণ করতে হবে হয়ত তাই ভেবে ছিলাম। কিন্তু না, ও সবের মধ্যে তিনি গেলেনই না। ওই সান্ধ্য বৈঠকে ছিলেন এক ভারতীয় মহিলা, তার হাতে, গলায়, কানে ঝলমলে অলংকার। অলংকার দেখে শ্রীমতী তামারা আর থাকতে পারেন নি। কিসের অলংকার, কি কি পাথর আছে ওই অলংকারে, পাথরের কি রকম দাম ইত্যাদি জানার বাসনায় তিনি আমার স্মরণাপন্ন হলেন।

ভারতীয় ভদ্রমহিলার হাতের ও গলার অলংকার তিনি নেড়ে চেড়ে দেখলেন। জানালেন, তাঁর ওগুলো ভালো লেগেছে। তামারার হাতে ও কানে ছিল দামী অলংকার। সেগুলো তিনি দেখালেন আমাদের। আমি বললাম—মস্কোয় তো কোনো অলংকারের দোকান নেই। মেয়েরা অলংকার কেনে কোত্থেকে।

তামারা জানাল—কেন পুরুষানুক্রমে যেসব পরিবার অলংকার পেয়েছেন,

তাঁদের কাছে তো আছেই, তাছাড়া ছোটখাট দোকানে বানানো যায়। কষ্ট্যুম জুয়েলারী তো পাওয়া যায় প্রচুর। রূপোর কিংবা কম ক্যারেট সোনার কিছু অলংকার পাওয়া যায় খোঁজ করলে। মেয়ে মাত্রেই অলংকার পছন্দ করে। কে না করে বলুন!

অলংকার নিয়ে আলোচনা করছি দেখে আমার বন্ধুরা রসিকতা শুরু করে দিল। তাদেরই একজন বললেন, দেখুন যত রাজনৈতিক পরিবর্তনই আসুক না কেন মানুষের কতকগুলো মনোবৃত্তি বদলানো মুশ্‌কিল। সমাজতান্ত্রিক দেশে সোনার অলংকার প্রায় নিষিদ্ধ। কিন্তু নারী মাত্রেই তার সহজাত প্রবৃত্তি অলংকারে ভূষিত হওয়া, সেজে-গুজে থাকা। এই সহজাত প্রবৃত্তিগুলো রুশ নারীদের মধ্যেও সজাগ রয়েছে। অলংকারের তেমন প্রচলন ও দোকান না থাকলেও, কোনো অভিজাত সমাবেশে অনেক মহিলাকে দেখা যাবে অলংকারে সেজে-গুজে এসেছেন। সোনার অলংকার একজনের হাত থেকে আরেক জনের হাতে বদল হয়। একটি পরিবার হয়ত বেচে দিয়েছে আরেকটি পরিবারকে। এইভাবে চলে হাত বদল।

ওই সান্ধ্য বৈঠকে আরেক রুশ ভদ্রমহিলাকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম, আতর-সুগন্ধি দ্রব্য ও লিপষ্টিকের ব্যবহার কেমন বাড়ছে আজকাল। আমার প্রশ্নের উত্তরে এক ভদ্রমহিলা বলেছিলেন—ডিপার্টমেণ্টাল ষ্টোর্সে গেলেই দেখতে পাবেন।

হোটেল থেকে বেরিয়েছি ডিপার্টমেণ্টাল ষ্টোর্স যাব বলে, রাস্তার ধারে একটি দোকানে ভীষণ ভিড় দেখে গেছি খোঁজ করতে। ভিড় ঠেলে দোকানে ঢুকে দেখি অবাক কাণ্ড। দোকানটিতে পোল্যাণ্ডের প্রসাধন দ্রব্যে ভর্তি। প্রসাধন দ্রব্য কিনতে লাইন লেগে গেছে।

মস্কোর সব চেয়ে বড় ডিপার্টমেণ্টাল ষ্টোর্স 'গুম্‌' এ ভিড় তো লেগেই আছে, সবচেয়ে বেশী ভিড় দেখেছি প্রসাধন দ্রব্যের কাউণ্টারে। এসেন্স, পারফিউম্‌ লিপষ্টিক, ক্রিমের ছড়াছড়ি। দশবছর আগে আমি অত রকমের প্রসাধন দ্রব্য দেখিনি। এবার রকমারি প্রসাধন দ্রব্য দেখলাম সোভিয়েত দেশে। প্রসাধন দ্রব্যের বিশেষ দোকানগুলোতে মহিলা খদ্দেরের ভিড় সব সময়েই লেগে আছে। প্রসাধন দ্রব্যের দাম সাংঘাতিক রকমের চড়া। তা সত্ত্বেও সেখানে ভিড় লেগে আছে। প্রসাধন দোকানে আবার কষ্ট্যুম জুয়েলারীও পাওয়া যায়।

ভিড় দেখেছি মেয়েদের চুল সাজাবার দোকানে। এক রুশ ভদ্রমহিলা বলছিলেন, চুল সাজাবার দোকানে একবার ঢুকলে বেরুনো দায়। সেখানে কর্মীর অভাব, তাই অনেক খদ্দেরকে অপেক্ষা করতে হয়। খোপা বাঁধার কায়দা রুশরাও পছন্দ করে। কেশ চর্চার পাট চলছে সারা সোভিয়েত ইউনিয়ন জুড়ে।

সোভিয়েত দেশে সৌখিন জিনিষের ব্যবহার বেড়েছে আগের তুলনায় অনেক বেশী। সৌখিন জিনিষ বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে ব্যবহার করে মেয়েরা। প্রসাধন, অলংকার ইত্যাদি। তার বৈচিত্র্যও বেড়েছে। দামও বেশী। কিন্তু ক্যামেরা সংক্রান্ত জিনিষ, খেলনা বা খেলার জিনিষের দাম খুবই সস্তা। এত সস্তা না দেখলে বিশ্বাস হবে না। সঙ্গীতের যন্ত্রপাতির দামও খুব বেশী নয়। বইএর মতন রেকর্ডের দামও জলের মতন। রেডিও এবং টেলিভিশন যন্ত্রের মধ্যে, রেডিওর দাম খুবই সস্তা। সেই অনুপাতে টেলিভিশনের দাম বেশ চড়া।

মস্কো কেন যেকোন বড় শহরের রেস্তোরাঁয় ঢুকলেই বিরক্তি বেড়ে যায়। লোকাভাব তাই খাবার আসতে দেরী হয়! কিন্তু সস্তায় এবং নানাধরনের খাবার পাওয়া যায় সেলফ্ সার্ভিস দোকানে। লণ্ডন-প্যারিসের মতন নতুন সাজে সজ্জিত বেশ কিছু সেলফ্-সার্ভিস দোকান দেখলাম এবার মস্কো শহরে। আমার এক ছাত্র বন্ধু আমায় নিয়ে গিয়েছিলেন এমনি এক সেলফ্-সার্ভিস রেস্তোরাঁয়। বেশ বড় হল ঘর। ঘরের দেয়াল পাইন কাঠে মোড়া। পাহাড় অঞ্চলে কাঠের বাড়িতে যেমন সাজানো গোছানো থাকে তেমনি ব্যবস্থা। রাশিয়ার পার্বত্য অঞ্চলে যে ধরনের খাবার বিখ্যাত তাই পাওয়া যায় এই সেল্ফ-সার্ভিস রেস্তোরাঁয়। নিজের ইচ্ছামতন খাবার বেছে তুলে নিতে হয়। পরিচারিকার জন্যে অপেক্ষা করে বসে থাকতে হয় না। তবে দুপুরবেলা বেশ ভিড়। ছাত্র-ছাত্রী তরুণদের ভিড়ই বেশী সেখানে। এ ধরনের বহু নতুন সেল্ফ-সার্ভিস রেস্তোরাঁ আজকাল খুলছে অনেক বড় শহরে। আধুনিকীকরণের এটাও একটি ধাপ।

## মস্কোর রাস্তাঘাট

রুশ বৈজ্ঞানিকরা অনেক মেহনৎ করে রকেট পাঠিয়েছিলেন চন্দ্র পৃষ্ঠের ছবি তুলতে। এত কষ্ট ও অর্থব্যয় করার দরকার ছিল না, রুশ বৈজ্ঞানিকরা একটু ভেবে চিন্তে কলকাতায় কয়েকজন ফটোগ্রাফার পাঠালেই তাঁদের গবেষণার কাজ সিদ্ধ হত। আমরা কলকাতাবাসীরা চন্দ্র পৃষ্ঠের মতন ঢেউ খেলানো রাজপথের ওপর দিয়ে রোজ যাতায়াত করি বলে আমাদের কৌতূহল চন্দ্র পৃষ্ঠের প্রতি অত গভীর নয়।

মস্কো কেন, সোভিয়েত দেশের যে কোনো শহরের রাস্তা-ঘাট পরিচ্ছন্ন। চন্দ্রপৃষ্ঠের ওপর দিয়ে তাঁদের গাড়ি চালাতে হয় না। বৃষ্টির জলে রাস্তায় হ্রদও তৈরী হয় না। অন্য যে কোনো উন্নত দেশের মতনই তাদের রাস্তা ঘাট বাঁধানো ও ঝকঝকে।

পাঁচ-দশ বছর আগে মস্কোর রাস্তাঘাট যে রকম দেখেছিলাম এবার গিয়ে দেখলাম পথ-ঘাট অনেক পরিচ্ছন্ন ও ঝকঝকে। গাড়ীর সংখ্যা বেড়েছে। মাঝারি আকারের ফিয়াট গাড়ীর ছড়াছড়ি। সেকেলে পুরোনো ভলগা, মস্কোভিচ্ ও পোবেদা গাড়ীগুলো এখন আর তেমন মস্কোর রাস্তায় দেখা যায় না।

মস্কোর রাস্তা চওড়া বলে নতুন গাড়ীগুলো ছুটে চলে ঘণ্টায় আশি-একশো কিলোমিটার বেগে। হুস্-হাস্ শব্দে চলে বেড়ায় গাড়ীগুলো। দেখে কলকাতার কথা ভাবি।

একদিন সকালে হোটেল বুদাপেস্ত থেকে বেরোবার সময় দেখি সামনের রাস্তা বন্ধ। রাস্তায় কাজ সুরু হয়ে গেছে। আগের দিন দেখেছিলাম রাস্তা ও ফুটপাথ ঝকঝকে। কোথাও চন্দ্রপৃষ্ঠের দাগ বা হ্রদের চিহ্ন নেই। আমি তো ভেবেই পাইনা। নতুন রাস্তা ভেঙ্গে আবার কেন মেরামত। আমাদের দেশে ভাঙা রাস্তা মেরামত হয় না আর কিনা এরা নতুন রাস্তা ভেঙ্গে মেরামত করছে। আমি তো তাজ্জব বনে গেলাম। সেদিন বিকেলে হোটেলে ঢোকার সময়ে লক্ষ্য করলাম রাস্তা অর্ধেকেরও বেশী তৈরী হয়ে গেছে। পরের দিন

আমার দোভাষীকে নিয়ে রাস্তা মেরামতকারী শ্রমিকদের সঙ্গে আলাপ করলাম। রাস্তাটা আধ মাইলের মতন হবে। শ্রমিকরা সংখ্যায় মাত্র ছ'জন। তুজন নারীশ্রমিক তুটো রোলার এঞ্জিন চালাচ্ছে, তুজন শ্রমিক পিচের যন্ত্র নিয়ে ঘটাং ঘটাং করছে আর বাকি কজন রাস্তায় পিচ্ জমাচ্ছে। এই কজনে রাস্তা ও ফুটপাত মেরামত করল দেড় দিনের মধ্যে। কলকাতায় হলে ত্রিশ জনে মিলে পনেরো দিন লাগিয়ে দিত।

রাস্তা মেরামতের কাজ করে যে সব শ্রমিক তাদের গায়ে সাদা জামা, জামার ওপর জহর কোটের মতন প্লাষ্টিকের হলদে রঙ হচ্ছে সাবধানতার চিহ্ন। রাস্তা মেরামতের কাজ হাল্কা কাজ নয় বরং বলব ভারী। সে কাজে মেয়েদের সংখ্যা প্রচুর।

মস্কোর রাস্তাঘাট ভাল বলে বাস ও ট্রলি বাস চলে দ্রুত বেগে। বাসগুলো রাত একটা পর্যন্ত চলাচল করে। আবার ভোর পাঁচটায় রাস্তায় নেমে পড়ে। বাসে কাউকে ঝুলে যেতে দেখিনি। বাসষ্টপে সবাই সারিবদ্ধ হয়ে অপেক্ষা করে। যে আগে আসে, সে আগে ওঠে। বেশীক্ষণ অপেক্ষা করতে হয় না। বাসে উঠে কণ্ডাক্টরের কাছে টিকিট কিনতে হয় না। কারণ কণ্ডাক্টর নামে কোনো বস্তু সেখানে নেই। একটি বাক্স আছে তাতে পয়সা ফেলতে হয়। যেখানেই যান না কেন ভাড়া একই। পাঁচ কোপেকে এক মাইলও যাওয়া যায় আবার পাঁচ মাইলও। বাসের সংখ্যা অগুনতি। একদিন ভোরে চলেছি মস্কোর শহরতলিতে, শহরের শেষ প্রান্তে দেখি একটা বাস ডিপোতে হাজার খানেক বাস, ডিপোতে বাস ধরছে না বলে রাস্তায় তুধারে অন্ততঃ আরও তুশো বাস দাঁড়িয়ে আছে। এটি শুধু একটি পাড়ার দৃশ্য। আরও গোটা চারেক এমনি বাস ডিপো রয়েছে মস্কো শহরে। এর থেকেই অনুমিত হতে পারে তাদের বাসের সংখ্যা কত।

মেট্রো অথবা সুড়ঙ্গ পথের ট্রেনের ব্যবস্থা আরও ভাল। প্রতি তু'মিনিট অন্তর একটা করে ট্রেন আসছে স্টেশনে। একই ভাড়ায় যে কোনো জায়গায় যাওয়া যায়। ষ্টেশনগুলো দেখবার মতন। কয়েকটা ষ্টেশনে মার্বেল পাথরের মেঝে, ওপরে ঝুলছে ঝাড়লণ্ঠন। মনে হবে যেন নামকরা কোনো হোটেলের নাচঘর।

মস্কোয় বাসস্থানের অসুবিধে এখনও রয়েছে বলে জানালেন শ্রীমতী তাতিয়ানা। তিনি বললেন সরকার তো প্রতি মাসেই বাড়ি বানাচ্ছেন কিন্তু

তাতেও কুলোচ্ছে না। তাই আজকাল অনেকে মিলে কো-অপারেটিভ সংস্থা খুলে বাড়ি বানাচ্ছেন। বানানো হলে যে যার ফ্ল্যাটে উঠে আসেন। কো-অপারেটিভ ফ্ল্যাটের সব চেয়ে বড় সুবিধে হল, নিজেদের ইচ্ছে মতন ঘরের, নক্সা করা। কেউ হয়ত শোবার ঘর বড় পছন্দ করেন, বসবার ঘর ছোট। ঠিক পছন্দ মতন ফ্ল্যাট নির্মাণ করা চলে। তবে এক্ষেত্রে খরচ বেশী পড়ে। মস্কোর ফ্ল্যাট ভাড়া ভীষণ সস্তা বলেই নাকি ঘরের এত চাহিদা। মস্কোয় একটা ফ্ল্যাট জোগাড় করা সত্যি কষ্টকর। এমনি এক কো-অপারেটিভ ফ্ল্যাট দেখালেন শ্রীমতী তাতিয়ানা। বেশ বড় বড় ঘর। নিজের ইচ্ছে মতন তিনি ঘর সাজিয়েছেন।

একদিন এক রুশ ডিপ্লোম্যাটের বাড়ি গিয়েছিলাম। সেখানে দেখলাম, এই ভদ্রলোক যে যে দেশে গেছেন সে সব দেশের স্মৃতি চিহ্ন স্বরূপ বহু জিনিষে বসবার ঘর সাজিয়েছেন। ঘরের দেয়ালে সাজিয়েছেন নানা রঙ দিয়ে তাঁর স্ত্রী। ঘর দোরে তাঁদের রুচির পরিচয় পেলাম।

## রাশিয়ায় নাইট ক্লাব

সম্প্রতি সোভিয়েত ইউনিয়ন পরিভ্রমণ করে এসে বন্ধু বান্ধবদের প্রশ্নবাণে যখন ক্লান্ত তখন একটি কথায় সবাইকে তাক লাগিয়ে দিয়েছিলাম। সোভিয়েত ইউনিয়নে রাজনীতি ও অর্থনীতির হাল-চাল নিয়ে বহু লোকে বহু প্রশ্ন করেছেন কিন্তু কেউ আজ পর্যন্ত আমায় নৈশ জীবন সম্বন্ধে প্রশ্ন করে নি। তার কারণ সবাই ধরে নেন যে সোভিয়েত ইউনিয়নে সব কাঠ-খোট্টার বাস। ওখানে আমোদ-প্রমোদের বালাই নেই। তাঁদের ধারণা কেবল মাত্র লণ্ডন—প্যারিস-বার্লিন-রোমে নৈশ জীবন ঝলমলে, নাইটক্লাব ও ক্যাবারে সেখানে মুখর। সোস্যালিষ্ট দেশ সোভিয়েত ইউনিয়নে যে নাইট ক্লাব ও ক্যাবারে থাকতে পারে সে চিন্তা অনেকের কল্পনাতেই আসে না।

দশ বছর আগে যখন প্রথমবার সোভিয়েত ইউনিয়নে বেড়াতে গেছি তখন অবশ্য সে প্রশ্ন ওঠে নি। নাইট ক্লাব ও ক্যাবারের কথা কেউ সেখানে ভাবতেনও না। এখন দিনকাল পাল্টেছে। গোঁড়ামী দূর হয়েছে। সোভিয়েত দেশ ভ্রমণ এখন আর অসম্ভব ব্যাপার নয়। সোভিয়েত দেশ সম্বন্ধে পশ্চিম

ইউরোপ ও আমেরিকার ধনতান্ত্রিক দেশগুলো এত সব আজগুবি গল্প ও রটনা করেছিল যে তার ফলে অদ্ভুত সব ধারণা পোষণ করে চলে বিদেশের বহু শিক্ষিত ব্যক্তিরা। অল্পশিক্ষিতদের তো কথাই নেই।

পশ্চিম ইউরোপের এবং আমেরিকার বড় শহরে রাত্রির অন্ধকারে যে সব নোংরামী চলে তারই প্রতীক অধিকাংশ নাইট ক্লাব ও ক্যাবারে। এককালে এ বিষয়ে প্যারিসের বহু দুর্ণাম ছিল। এই রোগ এখন পশ্চিম ইউরোপ ও আমেরিকার প্রায় সব শহরেই প্রবেশ করেছে। কিন্তু প্যারিসের দুর্ণাম ঘুচলো না।

আমার প্যারিস প্রবাস কালে বহু দেশী ও বিদেশী বন্ধুরা প্যারিসে বেড়াতে এসেই নাইট ক্লাব ও ক্যাবারে দেখার বায়না ধরত। আমি তাদের যতই বলতাম যে নাইট ক্লাব ও ক্যাবারেতে যা যা দেখতে চাও অর্থাৎ নারীর নগ্ন দেহ সে তো তোমাদের দেশের নাইট ক্লাব ও ক্যাবারেতেও দেখেছ এতে নতুনত্ব কোথায়। বরং প্যারিসের সাংস্কৃতিক দিকটা দেখে যাওনা। কার কথা কে শোনে। বহু বিদেশী ট্যুরিস্ট প্যারিসে হয়ত তিন-চার দিন কাটিয়েছেন, নাইট ক্লাব ও ক্যাবারেতে গেছেন প্রত্যেক রাত্রে কিন্তু এক দিনের জন্যও প্যারিসের কোনো আর্ট মিউজিয়ম বা ঐতিহাসিক নিদর্শনগুলো দেখেন নি। এমন বহু ব্যক্তিকে আমি জানি। ইউরোপ আমেরিকায় এই ধরনের লোকের সংখ্যা কম নয়। আমাদের দেশেও এ ধরনের লোকেদের মুখই আমি বেশী দেখেছি। এই ধরনের মানুষেরা যখন সোভিয়েত দেশে বেড়াতে যায় তখন স্বভাবতঃই বিস্মিত হন নৈশ জীবনে নোংরামি নেই দেখে। তাঁরা মনে করেন সোভিয়েত ইউনিয়ন পিছিয়ে পড়া দেশ। যাঁরা মনে করেন নাইট ক্লাব ক্যাবারের নোংরামী না থাকলে একটা দেশ পিছিয়ে তাঁদের সঙ্গে তর্ক করা বৃথা। এই ধরনের বহু ট্যুরিস্ট আজকাল সোভিয়েত ইউনিয়নে বেড়াতে যাচ্ছেন।

ইউরোপ-আমেরিকার ট্যুরিস্টের ভীড় এত বেড়েছে যে হোটেলে থাকার জায়গা দিতে না পেরে সোভিয়েত সরকার এখন প্রত্যেক বড় শহরে 'ইন্টুরিস্ট' হোটেল নির্মাণ করেছেন। ইন্টুরিস্ট হোটেলগুলো দেশলাই বাক্সের মতন। বিশ থেকে পঁচিশ তলা। এক মস্কো শহরে এই ধরনের বিশালাকায় হোটেল গজিয়েছে গত তিন বছরে গোটা তিনেক, আরও গোটা চারেক নির্মিত হচ্ছে দেখলাম।

ইউরোপ-আমেরিকার অতি আধুনিক হোটেলে যে ধরনের ব্যবস্থা, আরাম ও বিলাসিতার ব্যবস্থা আছে, ইন্ট্যুরিস্ট হোটেলগুলোতে একই ধরনের ব্যবস্থা পাওয়া যাচ্ছে।

মস্কোয় আগেও দুটো ছোট নাইট ক্লাব ছিল। কিন্তু সেগুলো নোংরা ছিল না। এবার দেখলাম এক বিরাটকায় রেস্তোরাঁ। আরবাট্‌ রেস্তোরাঁর দৈর্ঘ আধ কিলোমিটার। এই আরবাট্‌ রেস্তোরাঁয় তিন হাজার লোক একসঙ্গে বসে খেতে পারে। তারই একটি ঘরে বসে নাইট ক্লাব। সেখানে নাচাও চলে। রাত দশটার পর ক্যাবারের নাচ-গান সুরু হয়। লণ্ডন প্যারিসের ক্যাবারের নোংরামী বাদ দিয়ে এরাও সুন্দর নাচ-গানের ব্যবস্থা করেছে। নারীর নগ্ন দেহ ষ্ট্রিপ টিজ বাদ দিয়ে আর সব রকমের দৃশ্য ওখানে দেখানো হচ্ছে। নানা ধরনের খেলাও দেখানো হয়। দর্শকরা দেখে খুশী হন। বিদেশী ট্যুরিস্টদের আমি নাক সিটকাতে দেখিনি। বরং একটি আমেরিকান ট্যুরিস্ট ওই ক্যাবারের সুখ্যাতিই করলেন। তিনি নাচ-গান উপভোগ করেছেন।

মস্কোর 'স্লাভেলস্কা বাজার' রেস্তারাঁয় যে নাচ-গান হয় তার বৈশিষ্ট্য অন্য রকমের। রাশিয়ার লোক সঙ্গীত ও নৃত্য তাতে দেখানো হয়। বিদেশী দর্শকরা দেখে তাতে তৃপ্তি পাবেন সে বিষয়ে কারুর সন্দেহ নেই। আমার ভালোই লেগেছে।

মস্কোভা হোটেল বা হোটেল রাশিয়ায় নাইট ক্লাব বা ক্যাবারে নেই বটে কিন্তু তার নাচঘরে যে গানের আসর বসে সেগুলো কোনো মতেই নিকৃষ্ট নয়। হোটেল বুদাপেস্তের রেস্তোরাঁয় রাত্রিতে নাচ-গানের আসর বসে, সেখানেও বিদেশীদের ভিড়।

সবচেয়ে বেশী আশ্চর্য করেছে এস্তোনিয়ার রাজধানী তালিন শহরের নবতম হোটেল 'ভীরু'র নাইট ক্লাবটি। তালিনের হোটেল ভীরুর নাইট ক্লাবে সব কটি নাচ ও গান পরিচ্ছন্ন। প্রত্যেকটি দিয়েছে রুচির পরিচয়। ভিড় সেখানেও। বিদেশীর সংখ্যাই বেশী। গ্রীষ্মের ছুটিতে স্ক্যাণ্ডিনেভিয়ান দেশের প্রচুর ট্যুরিস্ট বেড়াতে এসেছিলেন তালিনে। তাদের অনেকেই 'ভীরু' হোটেলে ছিলেন। রাত্রে দেখলাম তাদের অনেকেই নাইট ক্লাবে ভিড় করেছে। সবার কৌতূহল সোভিয়েত দেশে নাইট ক্লাবে কি হয় তাই দেখতে।

অনেকে ভেবেছিল সোভিয়েত দেশের নাইট ক্লাবে সম্ভবতঃ কম্যুনিজম সম্বন্ধে বক্তৃতা শুনবে। কম্যুনিজম্ সম্বন্ধে বক্তৃতা দূরে থাক, কম্যুনিস্ট নাচও

দেখতে পেলাম না। অন্য সব দেশের নাইট ক্লাবে যে ধরনের নাচ-গান হয় তাই হল। তবে ষ্ট্রীপ্-টিজ, বা নারীকে বিবস্ত্র করার দৃশ্য দেখানো হয় নি। নারী দেহের সুডৌল অংশগুলো নগ্ন করে না দেখালেও অন্যভাবে দেখানো যায় তাই দেখানো হয়েছে তালিনের নাইট ক্লাবে। এক গায়িকা এলেন সিঁড়ি বেয়ে গান করতে করতে তার জামাটা সুন্দরভাবে সাজানো। চোখকে মুগ্ধ করে। তেমনি গোটা পনেরো মেয়ে এস্তোনিয়ার লোক নৃত্য প্রদর্শনের পর দেখালো অতি আধুনিক নাচ। পোষাকে রয়েছে শালীনতা কিন্তু প্রতিটি মেয়ের দেহের সৌষ্ঠবের প্রতি দৃষ্টি রেখেছেন কর্ম কর্তারা। একটি নাচের দৃশ্যে দেখলাম মেয়েরা স্নানের পোষাকে নাচছেন। ষ্ট্রিপ-টিজ না করেও যে নাচা যায় এটি তারই দৃষ্টান্ত। মেয়েদের সঙ্গে যে সব ছেলে নেচেছেন তারা প্রত্যেকেই ব্যালে নাচে পাকাপোক্ত। যে কজন গান গাইল তারাও পেশাদার গায়ক। এদের রোজগার অন্যদের চেয়ে অনেক বেশী। সোভিয়েত ইউনিয়নে শিল্পীদের কদরও যেমন বেশী তেমনি বেশী তাদের রোজগার।

এক সকালে তালিনের এক ছোট্ট কাফেতে বসে কফি ও কেক খাচ্ছিলাম। আমাদের পাশের টেবিলে একটি ছেলে ও মেয়েকে দেখে আমরা অবাক। মেয়েটি সুন্দরী কিন্তু গায়ের রং একটু তামাটে। শাড়ি পরলে মনে হবে যেন বাঙালী মেয়ে। বেশ লম্বা। বয়স হয়ত বাইশ-তেইশ।

তালিনের নাইট ক্লাবের নাচের মেয়েদের মধ্যে সেই মেয়েটাকে দেখে আমরা আরও আশ্চর্য হয়ে গেলাম। পরের দিন যথারীতি সকালে সেই কাফেতে কফি খেতে গিয়ে সেই মেয়েটির সঙ্গে আলাপ হল। নাম তার টিনা। আগের দিনের সেই ছেলেটাও তার সঙ্গে ছিল। আলাপ পরিচয়ে জানতে পেলাম যে টিনা তালিন শহরেরই মেয়ে। অপেরায় নাচ শিখেছে পাঁচ বছর ধরে। নাচের স্কুলে পাশ করা। অন্য যে সব মেয়েরা নেচেছে তাদের অধিকাংশই নাচের স্কুলে পাশ করা। নাচাই তাদের পেশা। এই জন্য তারা মাস গেলে মাইনে পান ভালই। রাত্রে একঘণ্টা নাচে বটে কিন্তু তার জন্যে নিয়মিত রেওয়াজ করতে হয়। এখন নাইট ক্লাবে নাচছে পরে অন্য জায়গায় ডাক এলে সেখানে নাচবে। তবে টিনার ছেলে বন্ধুটি বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র। সে পাশ্ করে বেরুলেই তাদের বিয়ে হবে। লণ্ডন-প্যারিসের নাইট ক্লাবের নাচিয়ে মেয়েদের মতন তাদের কোনো নোংরা জীবন যাপন করতে হয় না।

টিনাকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম, তুমি তো ব্যালে শিল্পী, তোমার খারাপ

লাগে না নাইট ক্লাবে নাচতে? একটি দৃশ্যে তো তুমি সুইমিং কস্টুম পরে নাচছিলে। তোমার লজ্জা করেনি?

উত্তরে টিনা বলেছিল—লজ্জার কি আছে। আর তাছাড়া নাচতে আমার মোটেই খারাপ লাগে না। আমি পরিশ্রম করে রোজগার করছি। রোজ আমাকে ঘণ্টা তিনেক তালিম নিতে হয়। পুঁজিবাদী দেশের নাইট ক্লাবে যে নোংরামী চলে এখানে সে ভয় নেই। যে কোনো শ্রমিকের মতন আমিও শ্রমিক। তবে শিল্পের শ্রমিক এই যা তফাৎ।

কথায় কথায় টিনা বলেছিল, তার বাড়ীতে রয়েছে বাবা-মা আর ছোট ভাই। বাবা ইঞ্জিনীয়ার। ভাই স্কুলে পড়ে।

প্যারিসের নাইট ক্লাবের নর্তকীদের সঙ্গেও আমার আলাপ হয়েছিল। তাদের মুখে শুনেছিলাম কত দুঃখের কাহিনী। তারাও সংসার করতে চায়। কিন্তু বাধা নাইট ক্লাবের নোংরা জীবন। টিনার বেলায় সে বাধা নেই। আমার মনে হয় পুঁজিবাদী দেশের নাইট ক্লাবের সঙ্গে সমাজতান্ত্রিক দেশের নাইট ক্লাবের শিল্পীদের জীবন এখানেই তফাৎ। সমাজতন্ত্রবাদী দেশের দোষ গুণ বিচার করতে হলে এই সব ছোটখাট জিনিষ দিয়ে বিচার করলে অনেক জটিল প্রশ্নের জবাব মিলবে।

টিনার বন্ধু ইয়ানকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম তুমি বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র। তোমার ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল। তুমি কদিন পরে টিনাকে বিয়ে করবে, টিনা নাইট ক্লাবের নাচিয়ে বলে তোমার মন খারাপ হয় না?

আমার প্রশ্ন শুনে ইয়ান অবাক হয়েছিল। সে বলেছিল, বারে! খারাপ লাগবে কেন? আমাদের দেশে প্রায় সব স্বামী-স্ত্রীই চাকরী করে। স্ত্রী চাকরী করবে বলে খারাপ লাগবে কেন। বরং আমার গর্ব হয় যে, আমার স্ত্রী হবে নাম করা নাচিয়ে। নাইট ক্লাবে নোংরামী নেই। সুতরাং নোংরামী সম্বন্ধে মোটেই চিন্তিত নই!

আমি তাকে প্রশ্নবাণে জর্জরিত করে তুলেছিলাম। বলেছিলাম, ধর বিয়ের পর প্রত্যেক রাত্রে তোমার স্ত্রী যদি রাত বারটায় ফেরে তবে তোমার মন নিশ্চই খারাপ হবে। হবে না?

উত্তরে ইয়ান বলেছিল, মোটেই হবে না। তাছাড়া টিনাকে তো সারা রাত নাচতে হয় না। রাত দশটা থেকে সাড়ে এগারোটা পর্যন্ত তো কাজ। তারপরেই ছুটি। এখন যেমন প্রায় রাত্রিরে যাই টিনাকে নিতে, তেমনি

তখনও সময় পেলে নিশ্চই তাকে বাড়ী নিয়ে আসব।

ওদের দুজনের মুখে-চোখে সেদিন দেখেছিলাম ওদের দৃঢ় প্রত্যয়। অনুমান করেছিলাম তাদের ভালবাসা দৃঢ়।

রুশ সার্কাস দেখবার মতন। সব দেশেই তার সুখ্যাতি। হয়ত একদিন সোভিয়েতদের নাইট ক্লাবের প্রশংসাও আমরা শুনতে পাব বিদেশীদের মুখে। আর যাদের অগাধ কৌতূহল তারা নিজেরাই একদিন সোভিয়েত নাইট ক্লাব দেখে সে কৌতূহল মেটাবেন।

## সোভিয়েত ইউনিয়নে বিদেশী ট্যুরিস্ট

দেশ-বিদেশ দেখার নেশা আমার অনেক কালের। সুযোগ ও সুবিধে পেলেই বেরিয়ে পড়ি। একটি ইউরোপীয় প্রবাদে বলে—অনেক বই পড়ে একটা দেশের যতখানি জানা যায় তার শতগুণ জানা যায় সে দেশ ভ্রমণ করে। এই প্রবাদ বাক্যকে মূলমন্ত্র করে আমিও দেশ-বিদেশে বেড়াই। অনেক দেশ সম্বন্ধে কত আজগুবি কাহিনী শুনেছি, কত না কাল্পনিক গল্প। সে-সব দেশ নিজের চোখে দেখে অনেক দুঃস্বপ্ন কেটে গেছে। গড়ে উঠেছে সে দেশের মানুষের সঙ্গে মৈত্রীর দৃঢ় বন্ধন।

সোভিয়েত ইউনিয়ন সম্বন্ধেও একথা খাটে। আমি যখন প্যারিসে, সংবাদপত্রের প্রতিনিধি হিসেবে ইউরোপের বিভিন্ন দেশ পরিভ্রমণ করছি তখন সোভিয়েত ইউনিয়ন সম্বন্ধে কত আজগুবি গল্পই না শুনেছি। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পরে সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলো সোভিয়েত ইউনিয়ন সম্বন্ধে কত না কুৎসা রটনা করেছে। এই সব অপপ্রচারের শিকার হয়েছিল ইউরোপের জনসাধারণ। তার নমুনা আমি স্বচক্ষে দেখেছি। বছর সাতেক আগে যখন আমি ঠিক করলাম সোভিয়েত ইউনিয়ন দেখতে যাব তখন আমার বিদেশী বন্ধুরা বলেছিল, তুমি মস্কোয় যাচ্ছ, দেখো ওরা তোমাকে আটকে রাখবে। বলা বাহুল্য তারা সবাই ছিল উচ্চ শিক্ষিত। আমি মস্কো গেলাম। সেখান থেকে আরও নানা জায়গা ঘুরে যখন আবার প্যারিস এসে পৌছলাম এবং সেখানকার উপহার দ্রব্য এনে বন্ধুদের দিলাম তখন সবাই অবাক। আমি তাদের বলেছিলাম—সোভিয়েত ইউনিয়ন ভ্রমণ করে আমার ভালই লেগেছে। কেউ আমাকে

আটকে রাখেনি। বরং সেখানে অনেক নতুন বন্ধুদের সঙ্গে বেশ স্ফূর্তিতে কাটিয়েছি। আমার দেওয়া বিস্তৃত বিবরণ শুনে সবার কৌতূহল আরও অনেক বেড়ে গেছে।

সোভিয়েত ইউনিয়ন যে আর পাঁচটা দেশের মতন মাটির দেশ, মানুষগুলো যে রক্তমাংসের সুখ-দুঃখ নিয়ে তারাও যে ঘর সংসার করে সে ধারণা অনেকের নেই। সাম্রাজ্যবাদীদের অপপ্রচারে বহু বিদেশী এমন সব ধারণা পোষণ করেন যে, সে-সব কথা আর না বলাই ভাল। সোভিয়েত ইউনিয়নে কোনরকমের যবনিকাই নেই। যা আছে তা হলো বহু বিদেশীর অজ্ঞতা আর হেঁয়ালির যবনিকা। মিথ্যা ও কুৎসা প্রচারে জনসাধারণকে বেশীদিন ভুলিয়ে রাখা যায় না। তাই বহু বিদেশী আজকাল দলে দলে সোভিয়েত ইউনিয়ন পর্যটনে যাচ্ছেন। সমগ্র ইউরোপ জুড়ে এখন চলছে একটি নতুন শিল্পের জয়যাত্রা। এটি কোনো লোহা-লক্করের শিল্প নয়। ট্যুরিস্ট শিল্প অর্থাৎ পর্যটকদের নিয়ে শিল্প। এই শিল্প ফেঁপে উঠেছে পশ্চিম ইউরোপে গত দশ বছর ধরে। তার ধাক্কা আমাদের দেশে এসেও লেগেছে।

ট্যুরিস্ট শিল্পে কোনো লোকসান নেই। বিদেশী পর্যটকরা দেশ দেখতে বেরোন, সেখানে তারা কয়েকদিনের জন্যে প্রচুর অর্থ ব্যয় করেন। সব রাষ্ট্রই চান বিদেশীরা আসুক দেশটাকে দেখে যাক। দেশ দেখলে অনেক ভুল বোঝা-বুঝির অবসান হয়। গড়ে ওঠে মৈত্রী। ঠিক এই উদ্দেশ্য নিয়েই সোভিয়েত ইউনিয়নে গড়ে উঠেছে ট্যুরিস্ট শিল্প। তাদের মূল উদ্দেশ্য—বিদেশী পর্যটক মারফৎ সোভিয়েত মৈত্রী আরও দৃঢ়তর হোক। মৈত্রী যতই দৃঢ় হবে ততই শান্তি স্থাপনা হবে চিরস্থায়ী।

যেভাবে ট্যুরিস্ট শিল্প গড়ে উঠেছে পশ্চিম ইউরোপে, ফ্রান্সে, ইতালিতে অথবা সুইজারল্যাণ্ডে ঠিক সেভাবে গড়ে ওঠেনি সোভিয়েত ইউনিয়নের ট্যুরিস্ট শিল্প। সোভিয়েত ইউনিয়নের অর্থনৈতিক কাঠামোর সঙ্গে পশ্চিমের ধনতান্ত্রিক দেশগুলোর অর্থনৈতিক কাঠামোর ফারাক আকাশ-পাতাল। ধনতান্ত্রিক দেশে ভারী শিল্পের আবির্ভাব হঠাৎ বা একদিনে ঘটানো সম্ভব হয়নি। তার জন্যে যে মূলধন প্রয়োজন সেটা এসেছে তিনটি ধাপে। যখন প্রথম ধাপটি ছিল নিত্যপ্রয়োজনীয় কনজুমার্স জিনিষ ও ব্যবসা শিল্প—যেমন বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি, ছোটখাট মেশিন তৈয়ারী। মধ্যম প্রকারের শিল্প থেকে যে মূলধন হয়েছে সেটা তারা সংগ্রহ করে পরে নির্মাণ করেছে লৌহ-ইস্পাত ইত্যাদি

ভারী শিল্পের কল-কারখানা। এসব করতে ধনতান্ত্রিক দেশগুলোর সময় লেগেছিলো কয়েকশো বছর। কিন্তু এটারই উল্টোভাবে সাজিয়ে একটি রাষ্ট্রকে যন্ত্র-শিল্পে স্বয়ং সম্পূর্ণ ও বিশ্বের প্রথম শ্রেণীর শিল্পোন্নত রাষ্ট্র হিসেবে গড়ে তুলতে সক্ষম হয়েছে সোভিয়েত ইউনিয়ন। সমাজতান্ত্রিক দেশের সমস্ত অর্থনৈতিক কাঠামো, ব্যবসা-বাণিজ্য, কলকারখানা নির্ভর করে পঞ্চ-বার্ষিকী পরিকল্পনার ওপর। তাঁরা ঠিক করেন কোন্ বছরে তাঁরা কোন্ শিল্পে হাত দেবেন। তাঁদের পরিকল্পনা অনুযায়ী শিল্পের আবির্ভাব হয়। হঠাৎ কারুর খেয়াল-খুশী বা ব্যক্তিগত লাভের জন্যে নয়। ফলে অনেক শিল্প আগে গড়ে উঠেছে, অনেক শিল্প পরে হয়েছে। পঞ্চ-বার্ষিকী পরিকল্পনা অনুযায়ী তারা প্রথমে গড়ে লৌহ-ইস্পাত, ভারী যন্ত্র-শিল্প। তার পরের ধাপ মধ্যম প্রকারের যন্ত্র-শিল্পে। তৃতীয় ধাপ হল নিত্য প্রয়োজনীয় 'কনজুমার্স গুড্‌স্'। সোভিয়েত ইউনিয়নে শিল্পোন্নয়ন ঘটেছে এইভাবে। বিশ বা ত্রিশ বছর আগে সেখানে যে ট্যুরিস্ট শিল্প গড়ে ওঠেনি তার কারণ তাদের পরিকল্পনা বা যোজনায় এই শিল্পের স্থান ছিল না। সোভিয়েত ইউনিয়নে এখন চলছে তৃতীয় ধাপের জয়যাত্রা। এই তৃতীয় ধাপের মধ্যে পড়ে ট্যুরিস্ট শিল্প। তাই গত পাঁচ বছরের মধ্যে এত হোটেল ও ট্যুরিস্টদের জন্যে সুবন্দোবস্ত গড়ে উঠেছে। পশ্চিম ইউরোপের ট্যুরিস্ট ব্যবসায় যে ধরণের কৌশল ও ব্যবস্থা অবলম্বন করা হয়ে থাকে ঠিক সেই ধরণের সব আয়োজন দেখা যাবে একালের সোভিয়েত হোটেলগুলিতে। একটি বিদেশী ট্যুরিস্ট যা চান তার সব চাহিদা মেটাচ্ছেন সোভিয়েত সরকার। 'ইন্‌ট্যুরিস্ট' প্রতিষ্ঠান এখন ফেঁপে উঠেছে। সারা দিন রাত, সারা বছর তাদের অফিসে ভিড় লেগেই আছে রাশিয়ায়, এসানিয়ায়, সিজুনিয়ার শহরগুলোতে। মস্কোর ইন্‌ট্যুরিস্ট অফিস তাদের আয়তন বাড়িয়েই চলেছে। হোটেলের সংখ্যা বাড়ছে আর বাড়ছে। মস্কোর ইন্‌ট্যুরিস্ট হোটেলে স্থান সঙ্কুলান হয় না বলে বৈদেশিক মন্ত্রণালয়ের সামনে আরও তিনটে দেশলাই বাক্স প্যাটার্ণের পঁচিশ তলার অট্টালিকা নির্মিত হচ্ছে দেখে এলাম। পাঁচ বছর আগে যখন হোটেল রাশিয়ায় উঠেছিলাম তখন সবাই বলত মস্কোয় এটাই সবচেয়ে বড় হোটেল। সর্বাধুনিক তো বটেই। হোটেল রাশিয়ার ঘর সর্বসমেত ছ' হাজার। এমন এলাহী ব্যাপার আমি আর কখনও দেখিনি-। প্রায় বিশ তলা উঁচু। এর এক একটা তলাই যেন এক একটা গ্র্যাণ্ড হোটেল। অনেক দেশের ছোট খাট একটি শহরের জনসংখ্যা এই হোটেল স্থান দিতে

পারে। কিন্তু এবার গিয়ে দেখি হোটেল রাশিয়া ম্লান হয়ে যাচ্ছে। এক মস্কোতে গেলে রাশিয়ার মতন আরও কয়েকটি হোটেল তৈরী হচ্ছে। ইতিমধ্যে ইনট্যুরিস্ট হোটেল তাকে টেক্কা দিয়েছে। এধরণের হোটেল শুধু মস্কোয় নির্মাণ করছেন না সোভিয়েত সরকার। তালিনের মতন ছোট্ট শহরেও পঁচিশ তলার বিরাট হোটেল নির্মিত হয়েছে বিদেশী ট্যুরিস্টদের জন্যে। এসকল হোটেল গড়ে উঠেছে তাসখন্দে, কিয়েভে, লেনিনগ্রাদে, মিনস্কে, এরিভানে, কিংবা বাকুতে।

আমাদের দেশেও ট্যুরিস্ট শিল্প গড়ে উঠেছে। ভারত সরকার চাইছেন বিদেশী ট্যুরিস্ট আরও আসুক। তার জন্যে লণ্ডন প্যারিস, রোম, ফ্রাঙ্কফুর্টে রয়েছে আমাদের ট্যুরিস্ট অফিস। বিদেশী ট্যুরিস্টরা তো আমাদের দেশে আসছেন এবং ভবিষ্যতে আরও আসবেন। কিন্তু তাঁরা কি চান বা তাঁদের আরও কত রকমের সুবিধা কিভাবে দেওয়া যেতে পারে সে সম্বন্ধে আমরা সোভিয়েত ইউনিয়নের ইনট্যুরিস্টের কাছে অনেক কিছু শিখতে পারি। আমাদের দেশে বিদেশী ট্যুরিস্টের সংখ্যা বাড়ছে, আমাদের সরকার আরও বেশী বিদেশী মুদ্রা অর্জন করতে সক্ষম হবেন যেমন করলেন সোভিয়েত সরকার। যদি আমরা বিদেশী ট্যুরিস্টদের জন্যে আরও সুবন্দোবস্ত করতে পারি। যেমন ধরুন সোভিয়েত ইউনিয়নের যে কোনো বড় শহরে বড় হোটেলে বা 'বিরিওজ্‌কা' দোকানে বিদেশী মুদ্রায় অর্ধেক দামে কেনা যায় উপহারের জিনিষ, ক্যামেরা, ঘড়ি, পানীয় ও ধূমপানের জিনিষ। বিদেশীরা আসেন দেশ দেখতে বাড়ী ফেরার সময়ে সঙ্গে নিয়ে যান সে দেশের স্মৃতিচিহ্ন হিসেবে উপহারের জিনিষ। সোভিয়েত সরকার এ ব্যবস্থা করে রেখেছেন সব শহরেই বড় রেল স্টেশনে, বিমান বন্দরে আর হোটেলে। এমনি ধরণের দোকান-পাট হতে পারে অনায়াসে আমাদের দেশে।

বিদেশীরা বেড়াতে আসেন, আমোদ প্রমোদও তাঁরা করতে চান। সন্ধ্যে-বেলাটা কাটাবার জন্যে যেমন রোম বা প্যারিসে রয়েছে মিউজিক হল, নাচ ঘর, নাইট ক্লাব-ক্যাবারে। তেমনি ব্যবস্থা করেছেন ইনট্যুরিস্ট সোভিয়েত ইউনিয়নের বড় বড় শহরে। এস্তোনিয়ার রাজধানী তালিনের হোটেল ভীরুতে আমি নাইট ক্লাব দেখে অবাক হয়ে গেছি। লণ্ডন-প্যারিসের নাইট ক্লাবের যে ধরণের নাচ-গান থাকে সেখানেও তাই কিন্তু তাতে কোনো নোংরামি নেই। এই যা তফাৎ। পশ্চিম ইউরোপে আমার অনেক বন্ধুরা সে খবর রাখেন না।

শুনলে তাঁরাও অবাক হবেন।

সাত বছর আগে জুলাই মাসের মধ্যে রাত্রে মস্কোগামী ট্রেনে উঠেছিলাম প্যারিসের 'গারতুনর' স্টেশনে। সোভিয়েত ট্রেনগুলো বেশ আরামদায়ক। দুই রাত্রি ট্রেনে কাটিয়ে দ্বিতীয় দিনের সকালে মস্কো পৌছলাম। ফ্রান্স, বেলজিহাম, জার্মানী, পোল্যাণ্ড পেরিয়ে এক ভোরে পৌছলাম মিনস্কে। ভোর চারটে হবে। স্টেশনে টাকা পয়সা ভাঙ্গিয়ে জল খাবার খেয়ে আবার রওনা হলাম মস্কোর পথে। ট্রেনে আলাপ হয়েছিল একটি ফরাসী পরিবারের সঙ্গে। তারা সমস্ত ব্যবস্থা পাকা করে এসেছেন ইন্‌ট্যুরিস্ট অফিস থেকে। আমার কোনো পূর্ব ব্যবস্থা নেই জেনে তারা একটু আশ্চর্য হলেন। আমি বললাম, দেখাই যাক না কেন। মস্কোয় পৌছে সব ব্যবস্থা হয়ে গেল।

তখন গ্রীষ্মকাল শুধু বিদেশী ট্যুরিস্ট নয় সোভিয়েত ট্যুরিস্টে মস্কো শহরে ছেয়ে গেছে। সোভিয়েত ইউনিয়নে পনেরোটি রাষ্ট্র। একটি নয় দুটো উপ-মহাদেশ জুড়লে যা হয় তাই। উজবেকিস্তান হল এসিয়ার লাটভিয়া উত্তর ইউরোপের। এই দুই দেশের জলবায়ু, প্রাকৃতিক পরিবেশ ও মানুষের চেহারা ও ভাষার বিস্তর ফারাক। এই দুই দেশের ট্যুরিস্টের কাছে তাদের দুই দেশ কোন বিস্ময়ের নয় এমনি ট্যুরিস্টের সংখ্যা সোভিয়েত ইউনিয়নে লাখ লাখ। উত্তরের ঠাণ্ডা দেশের লোকেরা যান দক্ষিণের এশিয়ার দেশে রোদ পোহাতে, দক্ষিণ রাস্ট্রের লোকেরা আসেন মস্কোয় বেড়াতে, অথবা উত্তরে লেনিনগ্রাদ কিংবা রিগার সমুদ্র তীরে। এস্তোনিয়ার পারনু সৈকতে ৩ বার দেখলাম দক্ষিণের বহু ট্যুরিস্ট সমুদ্র সৈকতে ভীড় জমিয়েছিল। তাদের জন্যে গড়ে উঠেছে নতুন নতুন হোটেল ও রেস্তোরাঁ। কৃষ্ণ উপসাগরের সোচীতে রুশ ট্যুরিস্টের ভিড় সবচেয়ে বেশী। গ্রীষ্মকালে এত ভিড় হয় যে বহু রুশ ট্যুরিস্ট যান ককেশাস পর্বত মালায়। সাইবেরিয়ায় যাঁরা বাস করেন তাঁরা ঠাণ্ডায় অভ্যস্ত। বেশী গরম তাদের সয় না। এমনি এক দম্পতির সঙ্গে আমার আলাপ হয় বছর পাঁচেক আগে মস্কোয়। সেবারও ছিল জুলাই মাসের গরম। রুশ ভদ্র মহিলা বলেছিলেন এত গরম আমার সয় না। ঠাণ্ডাই আমার ভাল লাগে। আমরা কালই উর্বর লেনিনগ্রাদের কাছে উত্তর সমুদ্রের তীরে পিটার্স হোফে যাব। সেখানে সমুদ্রের ধারও মিলবে আবার বেশ ঠাণ্ডাও।

আবার অনেক রুশ আছেন যাঁরা ঠাণ্ডা পছন্দ করে না তারা ভিড় জমান দক্ষিণে উষ্ম স্থানে। এবার আলোময় এক রুশ সাংবাদিক বন্ধু জানালেন তার

পরিবার গেছেন এস্তোনিয়ার পার্ন্যুতে। কারণ মস্কোর এত গরম তাদের ভাল লাগেনি। পার্ন্যুর ঠাণ্ডা মনোরম। যেমন আমাদের কলকাতাও নভেম্বর মাসে।

অনেককাল সোভিয়েত ইউনিয়নে কেবলমাত্র বিদেশী ট্যুরিস্টদের জন্য বন্দোবস্ত করেননি কেন সোভিয়েত সরকার এবার সেটা বোঝা গেল। সোভিয়েত ইউনিয়নে এত ট্যুরিস্ট রয়েছে যে তাদের জন্য আগে বন্দোবস্ত করতে ব্যস্ত ছিলেন সোভিয়েত সরকার। তাদের জন্যে সব ব্যবস্থা পূর্ণ হওয়ায় এখন তাঁরা সর্বদেশী ট্যুরিস্টদের জন্যে উঠে পড়ে লেগেছেন।

গ্রীষ্মকালে মস্কোর রাস্তায় বেরুলে বহু ট্যুরিস্টের মুখ দেখা যাবে। নানান রঙের পোষাকে সোভিয়েত ট্যুরিস্টরা মস্কোর রাস্তা ঝলমল করে ফেলে। ভারতীয়দের চেহারার মতন কিছু ট্যুরিস্টও দেখা যাবে তবে তাঁরা ভারতের নন। কেউ বা আজার বাইজানের কিংবা তাজিকিস্তানের।

এবার এক সন্ধ্যায় মস্কোর প্রধান রাস্তা দিয়ে হাঁটছি আমার সঙ্গে ছিলেন এক ভারতীয় পরিবার। শাড়ি পরা ভদ্রমহিলাকে দেখে দুই ভদ্রমহিলা গল্প জুড়ে দিলেন। সেই দুই ভদ্রমহিলা যদি শাড়ি পরতেন তবে তাঁকে ভারতীয় বলেই মনে হত। নিজেরাই বললেন তাঁরা বাকুর লোক। মায়ে-ঝিয়ে মস্কো বেড়াতে এসেছেন। মা ও মেয়ে শাড়ির প্রশংসা করতে লাগলেন। বললেন—ইন্দিস্কি? আমরা উত্তর দিলাম হ্যাঁ। জিজ্ঞেস করলেন কোন হোটেলে উঠেছ। তাঁরা হোটেল রাশিয়ায় উঠেছেন। বিরাট ঘর ইত্যাদি। এমন ভাবে গল্প জুড়ে দিল যেন কত কালের পরিচয়। আমাদের জিজ্ঞাসা করল, আমাদের বাড়ীতে কে কে আছে, ছেলে-মেয়ে কটি ইত্যাদি। তার নিজের ঘর-কন্নার কথাও সে পাড়ল। বাকুতে যাবার নিমন্ত্রণ জানালো তাঁরা। বললে—এসো সেখানে, পোলাও-কাবাব খাওয়াব। তোমরা তো ওসব খাও। আমরা লোভ সামলাতে পারলাম না। আমন্ত্রণ গ্রহণ. করলাম। ভবিষ্যতে আমি একদিন বাকু শহর দেখতে যাব এই আমার প্রতিজ্ঞা রইল বলে জানালাম। এমনি বহু সোভিয়েত ট্যুরিস্টের সঙ্গে আমার কত যে আলাপ এবং আলাপ থেকে বন্ধুত্বে পরিণত হয়েছে তার হিসেব নেই।

ইনট্যুরিস্টের এক ইন্টারপ্রেটার শ্রীমতি ভিয়েরার সঙ্গে আলাপ হয়েছিল পাঁচ বছর আগে। তাঁকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম—একাজ তোমার ভাল লাগে। উত্তরে শ্রীমতি ভিয়েরা জানিয়েছিল—খুব ভাল লাগে কত বিদেশীর সঙ্গে আলাপ

হয়। বিদেশ সম্বন্ধে কত আগ্রহ বেড়ে যায়। কত লোকের সঙ্গে আলাপ হয়। এমনি প্রশ্ন আমি করেছিলাম এবার তালিনের এক ইণ্টার প্রেটার শ্রীমতি এভিকে। শ্রীমতি এভি বলেছিলেন—একাজ আমি ছাড়ব না। আমাদের দেশের সঙ্গে বিদেশের মৈত্রী স্থাপন হবে দৃঢ়। যত বেশী বিদেশী আসবে আমাদের দেশে। তাহলে ভুল বোঝাবুঝি কমবে। শান্তির পথ হবে আরও প্রশস্ত।

## সাত বছর আগে যা দেখেছি

সোভিয়েত ইউনিয়নে আমি প্রথম যাই ১৯৬৫ সালে। প্যারিস থেকে মস্কো পর্যন্ত গেলাম ট্রেনে। প্রায় আটচল্লিশ ঘণ্টার পথ। অনেকগুলো দেশের মধ্য দিয়ে যেতে হয়েছে। মাঝে মাঝে থেমেছি দু'এক দিনের জন্যে। জার্মানী থেকে পোল্যাণ্ড। পোল্যাণ্ড থেকে মস্কো যাবার পথে পোল্যাণ্ডের গ্রামাঞ্চল, বেলোরাশিয়া ও রাশিয়ার গ্রামাঞ্চল দেখার সুযোগ হয়েছিল। বেলোরাশিয়ার ব্রেষ্ট শহর থেকে সুরু সোভিয়েত ইউনিয়ন, সেটা বিরাট রেল-ওয়ে জংশন। ব্রেষ্ট থেকে মস্কো পর্যন্ত রেলপথে সময় লাগে বিশ ঘণ্টা। সোভিয়েত ইউনিয়নের আয়তন এর থেকে খানিকটা বোঝা যাবে। তবে পাঁচ-ছ ঘণ্টা সময় নষ্ট হয়েছে বিভিন্ন দেশের সীমান্তে পুলিশ ও কাষ্টমস-এর হয়রানিতে। এসব দেশে চলে অতি মাত্রায় এবং অনর্থক হয়রানি। এক পশ্চিম বার্লিনের 'জু' রেল স্টেশন থেকে পূর্ব বার্লিনের রেল স্টেশন পৌছতে লাগে পুরো এক ঘণ্টা। যার দূরত্ব এক মাইল মাত্র। আবার সেখান থেকে পূর্ব জার্মানীর সীমানায় ফ্রাঙ্কফুট আম্ ওভার পৌছবার আগেই যাত্রীদের মালপত্র ও টাকা পয়সার হিসেব দিতে হয়েছে তিন-চারবার। তার পর পোল্যাণ্ড পৌছে আরেক ঝকমারি। এরপর যখন ব্রেষ্ট স্টেশনে আমাদের গাড়ী পৌছল রাত বারোটায় তখন দুঘণ্টা লাগল ট্রেন ছাড়তে। রুশ রেল লাইনের মাপ পশ্চিম ইউরোপের মতন নয়। তাই ট্রেনের চাকা ছোট-বড় করতে সময় লেগে গেল। তার ওপর তো কাষ্টমস ও পুলিশের কাজ আছেই।

ব্রেষ্ট রেল স্টেশনে নেমে চা খেয়ে দেখছিলাম, হল ঘরে অনেক যাত্রী বিশ্রাম করছেন। হয়ত ভোরের ট্রেনের অপেক্ষায়। রেল স্টেশনে খাবার দাবারের

বহর দেখে মনে হলো এবার রাশিয়ায় এসেছি। রাত দুটোর সময়ও রেস্তর াঁয় বেশ ভিড়। সবাই একটানা একটা কিছু চিবুচ্ছে। সেখান থেকে কিছু খাবার নিয়ে আমি আবার ট্রেনে উঠলাম। আমার কামরায় ওঠার আগে দেখছিলাম বহু নারী শ্রমিক রেল লাইনে কাজ করছে। স্টেশনে কর্মীদের মধ্যে অধিকাংশই মহিলা। কয়েকটা এঞ্জিন চালিয়ে নিয়ে যাচ্ছে মহিলা ইঞ্জিন ড্রাইভার।

বেলোরাশিয়া, রাশিয়া ও ইউক্রেসেয়ার গ্রামাঞ্চলগুলোর দৃশ্য একই রকমের। খুব বিশেষ পার্থক্য দেখলাম না। ওখানকার সব গ্রামের বাড়ি-ঘর সব একই ধরনের। কাঠের বাড়িই অধিকাংশ। উত্তর-ভারতের পাহাড় অঞ্চলের অনেক বাড়ি ঘরের সঙ্গে এর অনেক সাদৃশ্য আছে। তবে তফাৎও অনেক। যেমন প্রত্যেক গ্রামের ইস্কুল বাড়ি, পলিক্লিনিকগুলো পাকা দালান। যৌথ খামারগুলো বড়বড়। সেখানে ট্রাক্টের ইত্যাদির ছড়াছড়ি। গোলাঘর ও গবাদি পশুর আস্তানা। চাষীদের চেহারা হৃষ্টপুষ্ট। পোষাকে-পরিচ্ছদে দারিদ্রের ছাপ নেই। শিশুদের মুখে খুসির ভাব।

শহরের কথা স্বতন্ত্র। মিনস্ক ও স্মোলনেস্ক শহর প্রাচীন। তাদের দালান-কোঠায় বৈশিষ্ট্য হয়েছে শহরের পুরোনো অট্টালিকার পাশেই লম্বা-লম্বা নতুন বাড়ি গজিয়ে উঠছে।

সোভিয়েত ইউনিয়নে প্রত্যেকটি রাস্ট্র তার স্বতন্ত্র বজায় রেখেছে। একের সঙ্গে অপরের কোনো মিল নেই। ভাষায় সংস্কৃতির তফাৎ তো আছেই। এমনকি অর্থনৈতিক উৎপাদনে। বেলো রাশিয়া ও ইউক্রেনের কৃষি উৎপাদনের সঙ্গে রাশিয়ার ফারাক অনেক। বেলোরাশিয়া ও ইউক্রেনিয়ার আবহাওয়া ও মাটি ভাল তাই তার কৃষিজ উৎপাদন রাশিয়ার চেয়ে বেশী। বেলোরাশিয়া ও ইউক্রেনিয়ার মাঝখান দিয়ে যাবার সময় দেখেছি ক্ষেতে প্রচুর ফসল। রাশিয়ার গ্রাম্যপথ দিয়ে যাবার সময়ে ওদের মতন অত বাড়ন্ত ফসল তেমন চোখে পড়েনি। তবে রাশিয়া একটুখানি ছোট্ট দেশ নয়। আয়তনে ভারতের দুগুণ বড়। এক এক অঞ্চলে তার এক এক দৃশ্য। কৃষির ব্যাপারেও তাই। কোথাও বেশী কোথাও কম। আজকাল কোনো রাস্ট্রই কেবলমাত্র কৃষির ওপর সম্পূর্ণ নির্ভর করে বসে থাকে না। রাশিয়ায় খনিজ দ্রব্য পাওয়া যাচ্ছে অঢেল। তাই সেখানে নতুন নতুন কল-কারখানা গড়ে উঠছে। যন্ত্রশিল্পে এখন রাশিয়া অন্য অন্য রাস্ট্রের তুলনায় সবার ওপরে।

রাশিয়ার তুলনায় সোভিয়েত ইউনিয়নের কয়েকটি এশীয় রাষ্ট্র কৃষিতে

অনেক সমৃদ্ধশালী। সেখানে কৃষিজ দ্রব্য যেমন প্রচুর তেমনি খনিজ দ্রব্য। তাই ওইসব প্রদেশের লোকেরা খায় দায় ভাল।

ব্রেষ্ট থেকে মস্কো পর্যন্ত কোথাও ক্রুশ্চভের একটি ছবিও দেখলাম না। যিনি একবছর আগেও ছিলেন প্রধানমন্ত্রী। সেই নেতার একটা ছবিও মস্কোতে না দেখতে পেয়ে আমি একটু আশ্চর্য হয়েছিলাম। মস্কোয় ওয়াকেবহাল মহল আমায় বলেছিলেন, ক্রুশ্চভের অন্তর্ধানের পর পররাষ্ট্রনীতিতে বিশেষ পরিবর্তন হয়নি, তবে আভ্যন্তরীণ রাজনীতিতে সামান্য পরিবর্তন হয়েছে।

একজন চিত্র-শিল্পী বললেন, ক্রুশ্চভ চলে যাওয়ায় তাঁর কাজের কোনো পরিবর্তন হয়নি। বরং তিনি আরও মন দিয়ে নিজের ইচ্ছে মতন সৃষ্টি করে চলেছেন। সাহিত্যের বেলায়ও সেই একই কথা খাটে।

ক্রুশ্চভ সম্বন্ধে বলতে গিয়ে অনেক রুশ সাংবাদিক ও জনসাধারণ আমায় বলেছিলেন, স্তালিনের পর সোভিয়েত ইউনিয়নে অনেকখানি উদারনৈতিক আবহাওয়ার সৃষ্টি করেছিলেন। কিন্তু ক্রুশ্চভ আস্তে আস্তে সব ক্ষমতা নিজের হাতে নিচ্ছিলেন। একনায়কত্বের প্রতি রুশদের কোনদিনই আস্থা ছিল না। তাঁরা একনায়কত্বের কাজ মোটেই পছন্দ করেন না। তাই কম্যুনিষ্ট পার্টির নেতৃবৃন্দ তাঁদের দলের ও সরকারের নেতৃত্ব বণ্টন করে দিয়েছেন। ফলে কোনো ব্যক্তিবিশেষের একনায়ক হওয়ার সুযোগ থাকবে না।

বিলাসদ্রব্যের দাম সাংঘাতিক। এরা খায়দায় প্রচুর। তাতে বিলাসিতা কম। শীতকালে তাজা ফল বাজারে পাওয়া দুষ্কর। কিন্তু পাওয়া যায় সব টিনে। আমাদের দেশে বহু ব্যক্তি নিয়মিত অভুক্ত থাকেন। কিন্তু একশ্রেণীর লোক বিলাসদ্রব্যে ডুবে থাকেন। আমাদের বিলাসদ্রব্য মাত্র কয়েকজন মুষ্টিমেয়ের জন্যে। রাশিয়ায় তা নয়। খাবারদাবার যেমন সবার জন্যে তেমনি বিলাসদ্রব্য। কয়েকজন বিলাসদ্রব্য ভোগ করবেন আর সবাই অভুক্ত থাকবে সেটা ওদের নীতি নয়। এখানেই ওদের সঙ্গে আমাদের তফাৎ। এমনকি পশ্চিমদেশের সঙ্গে। পশ্চিমের অনেকেই এসে প্রথমে নাক সিটকান বিলাস দ্রব্যের তেমন ছড়াছড়ি নেই বলে। কিন্তু এটা তারা দেখেন না যে এ দেশে সবারই স্বাস্থ্য ভাল। দারিদ্র্য কোথাও নেই। অভিজাত পাড়া বলে কোনো পার্থক্য নেই। সব পাড়াই সমান। সবার বাড়ীতেই একই সুবিধে। সমাজ-তন্ত্রবাদ এরা সার্থক করে তুলতে চান বলেই সাধারণ ব্যাপারগুলোর দিকেই সরকারের দৃষ্টি প্রখর। তাই এরা বিলাসিতা বর্জন করে মানুষের প্রধান

প্রয়োজনগুলো মেটাতে কৃতকার্য হয়েছেন। আমরা কেন অনেক প্রতিবেশী রাষ্ট্রও তাতে কৃতকার্য হননি। সেটা আমার নিজের অভিজ্ঞতা থেকেই বলছি।

সাত বছর আগে আমি বিলাসদ্রব্যের যতখানি অ-প্রাচুর্য দেখেছি, সাতবছর পরে গিয়ে ততখানি দেখিনি। এখন বিলাসদ্রব্যও অনেক পাওয়া যাচ্ছে। যেমন, এসেন্স, পারফিউম, লিপষ্টিক ইত্যাদি আগের তুলনায় এখন অধিক সংখ্যায় পাওয়া যাচ্ছে বাজারে। ওদের প্রাচুর্য বাড়ছে, সম্পদ বাড়ছে। সুতরাং দেশের জনসাধারণও তার সুফল পাচ্ছে। ফলে পণ্যদ্রব্য ভোগও বাড়ছে। যা হওয়া উচিত তাই হয়েছে বলে অনেক নিন্দুক বিস্মিত হয়েছে।

শিল্প উৎপাদনে সোভিয়েত ইউনিয়ন এখন বিশ্বে দ্বিতীয় স্থান অধিকারী। শিল্পোন্নত এই বিরাট দেশে বিলাস দ্রব্যের ছড়াছড়ি না দেখতে পেয়ে অনেকে অনেক রকম মন্তব্য করে থাকেন। কিন্তু তারা একথা ভেবে দেখেন না যে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মতন শক্তিশালী রাষ্ট্রের সঙ্গে পাল্লা দিচ্ছে সোভিয়েত ইউনিয়ন কিসের জোরে। সোভিয়েতদের কলকারখানায় শুধু বিলাসদ্রব্যই প্রস্তুত হয় না। সেখানে নিত্যব্যবহার্য জিনিষপত্র থেকে আরম্ভ করে ঔষধ এবং অস্ত্র-সস্ত্র সবই তৈরী হয়। অস্ত্র-সস্ত্র স্পুটনিক থেকে আরম্ভ করে দূরপাল্লার ক্ষেপণাস্ত্র এই সবের নির্মান কাজ সোজা নয়। এ ব্যাপারে সোভিয়েত দেশ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে ছাড়িয়ে গেছে। তাদের তৈরী অস্ত্র-সস্ত্র এখন বিশ্বের বাজারে দেখা যাচ্ছে। তাছাড়া মার্কিনদের মতন এরাও বহু দেশকে আর্থিক সাহায্য দিয়ে আসছে।

লণ্ডন-প্যারিসের মতন চোখ ধাঁধাঁনো বিজ্ঞাপনের আলোক-মালার ছড়াছড়ি নেই। নেই অফুরন্ত কাফে-রেস্তোরাঁ। তবে প্রয়োজন মেটানোর মতন কাফে রেস্তোরাঁ রয়েছে। কাফে রেস্তোরাঁয় আমার সবচেয়ে বেশী খারাপ লেগেছে খাবারের জন্য প্রতীক্ষা করে থাকতে। সোভিয়েত ইউনিয়নের সর্বত্রই লোকের অভাব। কাজ আছে কিন্তু লোক নেই। তাই এই বিভ্রাট।

রাশিয়ায় জিনিষপত্রের দাম বাড়ছে না বরং কমতির দিকে। সৌখিন জিনিষ দামও কমছে। অনেক বছর ধরে মস্কোয় যে সব বিদেশী বাস করছেন, তাঁদের অনেকে বলেছেন, গত দু'বছর যাবৎ এখানে জিনিষপত্রের দাম কমের দিকে। আগের মতন তেমন কড়াকড়ি নেই। সমস্ত সোভিয়েত ইউনিয়নে খাদ্য-দ্রব্য চিকিৎসা, শিক্ষা, বই-পত্র, সিনেমা-থিয়েটার ও গ্রামাফোন রেকর্ডের দাম এত

সস্তা যা আমাদের দেশে বা পশ্চিম ইউরোপে কল্পনার অতীত। বাসস্থানের চাহিদা এখনও আছে। প্রতিদিন এরা বড় বড় ফ্ল্যাট-বাড়ি নির্মাণ করে চলেছে। আড়াইখানা ঘরের ফ্ল্যাট বাড়ির মাসিক ভাড়া কলকাতার তুলনায় অর্ধেকেরও কম। পশ্চিম ইউরোপে এটা অকল্পনীয়।

বিগত কয়েক বছর ধরে সোভিয়েত সরকার 'ভড্কা' পান-বিরোধী অভিযান চালিয়ে যাচ্ছে। ফলে রেস্তোরাঁ-কাফেতে ভডকার দাম বৃদ্ধি করা হয়েছে চতুর্গুন। বাইরের দোকানেও দাম বেশী। তা সত্ত্বেও মদ্যপান কমেনি। গ্রীষ্ম-কালের রাতে অনেককে দেখা যাবে টলটলায়মান।

সোভিয়েত ইউনিয়ন সমাজতান্ত্রিক দেশ বলে সবার মানসিকতা বদলে গেছে একথা ভাবলে তাদের প্রতি ভুবিচার করা হবে। মানুষ মানুষই। কৌতূহল, আর অজানাকে জানার ইচ্ছে তারও আছে। মস্কোর আন্তর্জাতিক ফিল্ম ফেষ্টিভ্যালে আমি দেখেছি জনসাধারণের কৌতূহল। মস্কোর আন্তর্জাতিক ফিল্ম ফেষ্টিভ্যাল সে এক এলাহি ব্যাপার। ক্রেমলিনের কংগ্রেস হলে বসে এই ফেষ্টিভ্যাল। এই হলে চার হাজার লোকের বসার ব্যবস্থা। পাঁচটি ভাষায় একই সময়ে অনূদিত হয়ে আসে ছবির ভাষ্য। ইয়ার ফোন তুলে নিজের ইচ্ছে মতন চাবি ঘুরিয়ে যে কোন একটি ভাষায় তা শোনা যায়। ওই হলে বসে সোভিয়েত ইউনিয়নের সর্বোচ্চ লোকসভার সভা। ফিল্ম ফেষ্টিভ্যালে শুধু একটি হলে ছবি দেখানো হয় না। মস্কোর আরও বড় বড় চারটি হলে একই সময়ে ফেষ্টিভ্যালের ছবি দেখানো হয়ে থাকে। তা সত্ত্বেও দর্শকের ভীড়ের অভাব নেই। আমাদের দেশে আন্তর্জাতিক ফিল্ম ফেষ্টিভ্যালে যেমন টিকিট পাওয়া যায় না, তেমনি সেখানেও। লাখলাখ দর্শকের চাহিদা মেটানো সম্ভব নয়। ফলে টিকিট নিয়ে কাড়াকাড়ি পড়ে যায়। সিনেমা হলের সামনে দেখেছি বহু ব্যর্থ দর্শকের করুণ আবেদন, একটা বাড়তি টিকিট আছে কি? দয়া করে দিন না। বিদেশী ছবি দেখার কৌতূহল যেমন আমাদের দেশের দর্শকের তেমনি তাদেরও।

সবচেয়ে আশ্চর্য করছে ট্যাক্সি ড্রাইভাররা। ওদের প্রতি সন্তুষ্ট নই আমি কোনোদিন। মনে হবে যেন আমি হাওড়া স্টেশনে দাঁড়িয়ে আছি। বেলো-রাশিয়া স্টেশনের সামনে দাঁড়িয়ে আছি। আমার গন্তব্য স্থল দূরে নয় বলে ট্যাক্সি ড্রাইভার আমায় সামনের সীটে বসিয়ে রাখে। খানিকক্ষণ বসে থাকার পর একজন কণ্ট্রোলার এসে ড্রাইভারকে বলতেই সে আমায় তখনই নিয়ে

যেতে বাধ্য হয়। মস্কোয় ট্যাক্সি ড্রাইভাররা গণ্ডগোল করে বলেই বড় বড় রাস্তার মোড়ে ট্যাক্সি স্ট্যাণ্ডে প্রায়ই দেখা যায় পুলিশ অথবা কণ্ট্রোলার।

সাধারণ দোকানপাট ছাড়াও ফুট পাথের ধারে আজকাল শাক-সব্জী, ডিম, ফলমূল বিক্রী হচ্ছে। শনিবারে ও রবিবারে গ্রাম থেকে অনেকে আসে মস্কোর রাস্তার ধারে ফলমূল বেচতে। অনেক চাষী নিজের 'কিচেন-গার্ডেনে' যে সব শাক-সব্জী ফলমূল উৎপন্ন করে তাই বেচতে আসেন। মস্কোয় টাটকা শাক-সব্জী ও ফল-মূলের চাহিদা সাংঘাতিক। অল্প সময়ের মধ্যে সব বিক্রি হয়ে যায়। বিক্রির টাকা নিয়ে জিনিসপত্র কিনে, মস্কো বেড়িয়ে বাড়ি ফেরে। অনেকটা রথ দেখা কলা বেচার মতন।

শাক-সব্জী বা ফলমূলের মতই চাহিদা আছে রাস্তার ধারে নতুন বই ও সাময়িক পত্রিকার। নতুন বই প্রকাশ হবার পরেই আমি রাস্তার ধারে নায্য মূল্যে বিক্রি হতে দেখেছি। এবং দেখেছি এক ঘণ্টার মধ্যে সব বিক্রি হয়ে গেছে। নতুন সাময়িক পত্রিকা, নতুন বই ও গানের নতুন রেকর্ড কোন দোকানে আবিক্রিত হয়ে পড়ে থাকে না। সোভিয়েত জনগণ এ বিষয়ে অনেক এগিয়ে আছে। বাসে-ট্রামে ও মেট্রোতে আমি প্রচুর সংখ্যক যাত্রীদের দেখেছি মনোযোগ দিয়ে বই পড়তে। এরা বই পড়তে ভাল বাসে। সময় পেলেই একটা কিছু পড়ছে দেখা যাবে। জানার আগ্রহ ও কৌতূহল আছে বলেই এটা সম্ভব। তাছাড়া জনসাধারণের মনের উৎকর্ষ বাড়ে এতে। এ বিষয়ে আমাদের দেশের জনসাধারণ ঠিক তার উল্টো। প্রথমতঃ বইপত্র কেউ সহজে পড়তে চান না দ্বিতীয়তঃ বই কিনতে কেউ চান না। পরের কাছ থেকে ধার করে বই পড়া অধিকাংশের মনের ইচ্ছে। এই কারণেই ভাল বই সহজে বিক্রি হয় না। বই এর প্রচার সংখা অন্য দেশের তুলনায় আমাদের দেশে অতি নগণ্য। তার ওপর আমাদের নিরক্ষরের সংখ্যা সবার ওপরে। সোভিয়েত দেশে সে সমস্যা নেই। তাদের সবাই সাক্ষর। অবশ্য রুশ বিপ্লবের আগে ওদের নিরক্ষরদের সংখ্যা ছিল আমাদের মতনই। তারা বহু প্রচেষ্টার নিরক্ষরতা দূর করেছে। আমরা এ বিষয়ে বেশী দূর এগুতে পারিনি। এ ধরণের ব্যর্থতার কথা না বলাই ভাল। শুধু বই কেন সংবাদপত্রের বেলায়ও একই কথা খাটে। সোভিয়েত দেশে বিখ্যাত সংবাদপত্রগুলোর প্রচার সংখ্যা দশ-বিশ লাখের নীচে কথাই বলে না। আর আমাদের আড়াই হাজার হলেই আঙুল ফুলে কলা গাছ।

মস্কোর কাছে ত্রিশ কিলোমিটার দূরে এক যৌথ খামার দেখতে গিয়েছিলাম। এটি শোভখোজ বা স্টেট ফার্ম। এই যৌথ খামারের মালিক হচ্ছে সরকার। অন্যান্য সরকারী কর্মচারীদের মতই সুযোগ সুবিধে পেয়ে থাকে এখানকার শোভখোজের কর্মচারীরা। এই যৌথ খামার তিনশ পনর একর জমিতে চাষ করে। তাদের রয়েছে পঁচিশটি ট্রাক্টর। শ্রমিকদের জন্যে রয়েছে পাকা দালান বাড়ি। শিশুদের জন্য বিশেষ বাসস্থান। কারণ, মায়েরা এখানে তাদের শিশু সন্তানদের রেখে কাজে যায়। লাইব্রেরী, সিনেমা, থিয়েটার তো রয়েছেই। সামনেই পুকুর। সেখানেই দেখলাম বালখিল্যের দল জলে দৌড় ঝাঁপ দিচ্ছে।

এই যৌথ খামারে গম বা ধান হয় না। রাশিয়ার আবহাওয়া এমনই যে, গ্রীষ্মকালেও কাঁচের ঢাকনি দেওয়া জমিতে শাক-সব্জীর চাষ হয়। ঠাণ্ডায় খোলা জমির কথা ভাবাই যায় না। হাজার হাজার শূকর রয়েছে এখানে। শাক-সব্জী ও শূকরের মাংস এখান থেকে চালান দেওয়া হয় মস্কোর মতন বড় শহরে। এই যৌথ খামারের শ্রমিকদের মাসিক রোজগার দেড়শ রুবল। মাইনে থেকে খানিকটা দেয় সমাজ বীমায়।

মস্কোর কাছেই অসংখ্য কলকারখানা। 'মস্কোভিচ' নামে ছোট মোটর গাড়ির কারখানা এখানেই। এই অঞ্চলের কলকারখানা দেখে মনে হল যেন কলকাতার উপকণ্ঠে কারখানার পাশ দিয়ে যাচ্ছি। কারখানার পর কারখানার সারি। চিমনি-ধোঁয়া ও লোহা-লক্করের ছড়াছড়ি।

সোভিয়েত ইউনিয়নে সব চেয়ে বেশী যা চোখে পড়বে তা হল শিশুর দল। সোভিয়েত ইউনিয়নে শিশুর চেহারা সত্যিই দেখার মত। সবাই স্বাস্থ্যবান। দেখতে গাঁট্টা-গোট্টা। সর্বোৎকৃষ্ট খাদ্য ও চিকিৎসা ওরা লাভ করে থাকে। শিশুদের স্বাস্থ্য ও মনোরঞ্জনের জন্য সব রকমের উৎকৃষ্ট ব্যবস্থা করে রেখেছে সোভিয়েত সরকার। এ ব্যাপারে এরা সব দেশকে টেক্কা মেরে দিয়েছে। এ বিষয়ে সরকার পক্ষের কোনো কার্পণ্য দেখা যাবে না। তাদের শিশুরাই জাতির ভবিষ্যৎ। তাদের মানুষ করা হচ্ছে সুস্থ পরিবেশের মধ্যে। ওদের জন্যেই সব। তাদের খেলাধূলো থেকে আরম্ভ করে শিক্ষা ব্যবস্থার সব ভার সরকারের হাতে। ইস্কুল কলেজে পড়তে কোনো খরচ নেই। আধুনিকতম শিক্ষার ব্যবস্থা তাঁরা করে রেখেছেন। এ ব্যাপারে কাউকে কোনো দিন কোনো রকমের সমালোচনা করতে দেখিনি। ছেলে-মেয়েদের মেধা বুঝে তার

শিক্ষার ব্যবস্থা। আমাদের দেশে যেমন শুধু ধনীর দুলালদের শ্রেষ্ঠ শিক্ষার ব্যবস্থা ওদের তা নেই। ছাত্রের মেধা বুঝে তার ব্যবস্থা। বড় চাকুরে বা শ্রমিকের সন্তানদের সবার জন্যে একই শিক্ষা ব্যবস্থা। চড় চাকরের ছেলে-মেয়েদের কোনো বিশেষ সুযোগ সুবিধে দেওয়া হয় না। পরীক্ষায় যে যেমন ফল করবে তেমন ভাবে তার পরিবর্তে শিক্ষার ব্যবস্থা হবে। চাকরীর ব্যাপারেও তাই। কোনো বাছ-বিচার নেই। সবার দাবীই সমান। কাজের যোগ্যতা অনুসারে তার বিচার হবে। মামা-পিসের, ধরাধরির ব্যাপার নেই। যেমন রয়েছে আমাদের দেশে।

রুশরা এখন এক বগ্‌গা নীতি বর্জন করে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান নীতি পালন করেছে। ফলে আগের তুলনায় রুশ পররাস্ট্রনীতির অনেক পরিবর্তন হয়েছে। পূর্ব জার্মানীর প্রতি এদের পররাস্ট্রনীতির বিষয়ে পরিবর্তন হয়নি। কিন্তু পশ্চিম জার্মানীর প্রতি রুশ নীতি অনেকখানি পরিবর্তন হয়েছে। তাদের প্রতি রুশরা এখন নরম ও সহানুভূতিসম্পন্ন। পশ্চিম জার্মানীর সঙ্গে রাশিয়ার বাণিজ্য বেড়েই চলেছে।

ভারতের প্রতি রুশ পররাস্ট্রনীতি সহানুভূতিশীল। ভারতের প্রতি এদের মনোভাব মিত্র ভাবাপন্ন। রুশ জনসাধারনের মনোভাব ভারতের প্রতি বন্ধুত্ব পূর্ণই দেখেছি। বরং দুদেশে মৈত্রী উত্তরোত্তর বৃদ্ধিই পাচ্ছে।

চীনের সঙ্গে সোভিয়েত ইউনিয়নের সম্পর্ক দিনকে দিন শিথিল হচ্ছে। মস্কো হতে চীনা ছাত্ররা চলে যাচ্ছে। চীনাদের প্রতি রুশ মনোভাব ভাল নয়। সেদিক দিয়ে বিচার করলে দেখা যাবে পশ্চিম ইউরোপের প্রতি রুশ মনোভাব বন্ধুত্বপূর্ণ। একালের রুশরা খুব বেশী করে ঝুঁকছে ফ্রান্স ও ইতালির দিকে। ফ্রান্সের দ্যাগল সরকারের সঙ্গে এখন রুশ সরকারের গলায় গলায় ভাব। ১৪ই জুলাই ছিল ফ্রান্সের জাতীয় উৎসব যার নাম ফরাসী বিপ্লব দিবস। এই দিন আমি মস্কো রেডিওতে সারাদিন ধরে ফরাসী সঙ্গীত শুনলাম।

## লেনিনগ্রাদের চোখে মস্কো

কে বড়? মস্কো না লেনিনগ্রাদ? এই চিরন্তন প্রশ্ন দুই শহরবাসীর। মস্কোবাসীরা বলেন, মস্কো রাজধানী, সত্তর লক্ষ লোকের বাস, আন্তর্জাতিক শহর মস্কোর আয়তন বাড়ছে আর বাড়ছে। তার যেন বাড়ার শেষ নেই। লেনিনগ্রাদের লোকেরা বলেন, মস্কো ল্যাপা-ছোপা তার সৌন্দর্য নেই। মোট কথা মস্কো স্থূল সৌন্দর্যের প্রতীক। লেনিনগ্রাদ তা নয়। রাশিয়ার ভেনিস। শহরময় স্থাপত্য শিল্পের ছড়াছড়ি। স্থাপত্য শিল্পের সূক্ষ্ম কাজ দেখতে হলে, লেনিনগ্রাদ যেতে হবে, মস্কোয় নয়।

মস্কো গেলেই আমার নয়া দিল্লীর কথা মনে পড়ে। শহর হিসেবে মস্কো বিরাট। স্থাপত্য সৌন্দর্যের দিক থেকে মস্কো স্থূল। এখানে সূক্ষ্ম কারুকার্যের সন্ধান মেলা ভার। লেনিনগ্রাদ সেদিক দিয়ে স্বর্গ। ল্যাটভিয়ার রাজধানী রিগা, এস্তোনিয়ার রাজধানী তালিন কিংবা ইউক্রেনিয়ার রাজধানী কিয়েভ শহর মস্কোর তুলনায় বহুপরিমাণে সুন্দর। সেখানকার জীবনধারাও বিভিন্ন রকমের। প্রাক্ বিপ্লব যুগে লেনিনগ্রাদের নাম ছিল সেণ্টপিটার্স বুর্গ। সেণ্ট পিটার্স বুর্গ-কে বলা হয় রাশিয়ার ভেনিস। অর্থাৎ ভাসমান শহর। ভেনিসের মতন সূক্ষ্ম কারুকার্য বা স্থাপত্য সৌন্দর্য অত নেই লেনিনগ্রাদে। তবে তার প্রচেষ্টা করেছেন রুশ স্থপতিরা সেকালের রাজরাজাদের আমলে। কয়েকশ' বছর আগে জার আমলে গড়ে ওঠে ভাসমান শহর সেণ্ট পিটার্স বুর্গ। সেই সেণ্ট পিটার্স বুর্গে রাশিয়ার রাজধানীও কয়েকবার স্থানান্তরিত হয়েছিল। রাজকীয় প্রভাব এখনও দেখা যাবে ওখানকার প্রাসাদগুলোতে। জার আমলে গত আড়াইশ বছরে রুশ মহারাজারা সেণ্ট পিটার্স বুর্গ বা একালের লেনিনগ্রাদকে সব দিক দিয়ে সাজাবার চেষ্টা করেছিলেন। তারই নিদর্শন দেখতে পাওয়া যাবে একালের লেনিনগ্রাদে। লেনিনগ্রাদে রয়েছে অসংখ্য প্রাসাদ, প্রায় তিনশ ছোট-বড় সাঁকো ও খাল। লেনিনগ্রাদ সমুদ্রের কাছেই। তার মাঝখান দিয়ে বয়ে গেছে নেভা নদী। গ্রীষ্মকালে লেনিনগ্রাদে রাত্রির অন্ধকার চোখে পড়েনি। রাত্রি বারোটায় একটায় দেখেছি সন্ধ্যার আলো। গ্রীষ্মকালে

লেনিনগ্রাদের আবহাওয়া মনোরম বলেই ওখানে আগে রুশ সাহিত্যিকদের আড্ডা বসত শিল্পীদের আড্ডা এখনও চলছে। এককথায় সেকালে যেমন লেনিনগ্রাদ ছিল সাংস্কৃতিক পীঠস্থান ঠিক তেমনি এখনও সে তার ঐতিহ্য বজায় রেখে চলেছে।. এই সব কারণেই লেনিনগ্রাদের অধিবাসীরা তাদের শহরের গর্বে গর্বিত। এবং একই কারণে তাঁরা মস্কোকে নিচু চোখে দেখে থাকেন।

মস্কোবাসীরা যতই আস্ফালন করুন না কেন, লেনিনগ্রাদ বাসীর সামনে তাঁরা চুপ হয়ে যান। অনেক রুশ বন্ধু আমায় বলেছেন, মেধাবী ছাত্র, শিল্পী-সাহিত্যিকদের অধিকাংশ আসেন লেনিনগ্রাদ থেকে। মস্কোর সঙ্গে তাই লণ্ডন-প্যারিসের তুলনা করা চলে না, চলে লেনিনগ্রাদের সঙ্গে।

লেনিনগ্রাদের কাছেই ত্রিশ কিলোমিটার দূরে গিয়েছিলাম 'পিটার্স হফ্' প্রাসাদ দেখতে। উত্তর সাগরের তীরে রুশ সম্রাট পিটার তাঁর গ্রীষ্মকালীন প্রাসাদ নির্মাণ করেছিলেন। এক কথায় এটি ফোয়ারার প্রাসাদ। রোমের উপকণ্ঠে টিভলি প্রাসাদের নকল। হাজার খানেক ফোয়ারা ছড়িয়ে রয়েছে এই প্রাসাদের বাগানে। সামনেই সমুদ্র। জার আমলে রুশ রাজাদের সৌখিন মানসিকতার পরিচয় পাওয়া যাবে এর থেকেই। জারেরা গ্রীষ্মকালে আসতেন সমুদ্রের ধারে বেড়াতে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময়ে এই প্রাসাদ ও ফোয়ারার কিছু অংশ বিধ্বস্ত হয়েছিল। ঠিক যেমন ছিল অনুরূপভাবে আবার পুনর্নির্মাণ করে সাজিয়ে রাখা হয়েছে। গ্রীষ্মকালে এখন আর রাজরাজারা বেড়াতে আসেন না, আসেন সোভিয়েত ইউনিয়নের অগণিত শ্রমিক-কৃষক অথবা নিছক পর্যটক। আমাদের মতন বিদেশীর মুখও দেখা যাবে গ্রীষ্মকালে পিটার্স ফকে।

লেনিনগ্রাদ শিল্প নগরী, তাই মিউজিয়ম ও আর্টগ্যালারির সংখ্যা কম নয়। এদের মধ্যে হারমিটেজ মিউজিয়ম রুশ দেশের মধ্যে সবচেয়ে বড়। এককালে এটি ছিল জারদের শীতকালীন প্রাসাদ। হারমিটেজ মিউজিয়ম পৃথিবীর যে কোনো বৃহৎ মিউজিয়মের সঙ্গে পাল্লা দিতে পারে। এর সংগ্রহশালায় রয়েছে বিশ্বের শ্রেষ্ঠ চিত্র-শিল্পীদের অমর অবদান। হারমিটেজ মিউজিয়মে দর্শকের ভীড় লেগেই আছে। চিত্র-রসিকের সংখ্যা শুধু উঁচু মহলেই সীমাবদ্ধ নয় সেটা বোঝা যাবে রাশিয়ায় এলে। আমি হারমিটেজ মিউজিয়মে দেখেছি বহু কৃষক-শ্রমিক, ইস্কুলের ছাত্র-ছাত্রী মনোযোগ দিয়ে শুনছে গাইডের বক্তৃতা।

গাইডারও ভাল বুঝিয়ে বলতে পারেন। কোন ছবিটা কোন যুগে এবং কোন পরিবেশে শিল্পী এঁকেছিলেন সে সময়ে সামাজিক পরিবেশই বা কেমন ছিল সব কিছুর সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা করেছেন গাইড। একটা ছবি শুধু পটে লেখা নয়। ছবিটার বাস্তব ধর্ম ব্যক্ত করাও শিল্পিদের উদ্দেশ্য। তার সঠিক ব্যাখ্যা শুনলে অনেক দুরূহ ছবিও সাধারণের কাছে সহজ বোধগম্য হতে পারে। তাহলে শিল্পির সৃষ্টি ও দর্শকের মধ্যে কোনো ভুল বোঝাবুঝি থাকতে পারে না। এই কারণেই মিউজিয়মে থাকা চাই ভাল শিক্ষিত গাইড। রুশ সরকার প্রায় সব মিউজিয়মেই রেখেছেন ট্রেনড্ গাইড।

আমি লেনিনগ্রাদ গিয়েছিলাম ট্রেনে। লেনিনগ্রাদ থেকে মস্কোয় ফিরেছি ট্রেনে। গ্রীষ্মের রাত বারটা-একটায় লেনিনগ্রাদে সাঁকোর ওপর দিয়ে হেঁটেছি, মনে হয়েছে যেন সন্ধ্যেবেলায় বেড়িয়েছি। যখন ট্রেনে চাপলাম তখন রাত বারটা হবে। গভীর রাত্রির অন্ধকারের কোনো স্পর্শ নেই। রুশ ট্রেনগুলো বেশ আরামদায়ক। ঝাঁকুনি নেই। প্রত্যেক কম্পার্টমেণ্টে শোবার ব্যবস্থা। বিছানা তো আছেই। ভিড়-ঠেলাঠেলি নেই। যে যার সীটে বসে বা শুয়ে চলেছে। মস্কো পৌঁছলাম বেলা দশটার সময়। ট্রেনে এক মস্কোবাসীর সঙ্গে আলাপ হল। তাঁকে আমি লেনিনগ্রাদের প্রশংসা করছিলাম। উত্তরে ভদ্রলোক বললেন, মস্কোর ওপর দিয়ে অনেক ঝড় বয়ে গেছে গত কয়েক শতাব্দী ধরে। বিপ্লবের পর মস্কোর স্থাপত্য পরিকল্পনা কয়েকবার অদলবদল হয়েছে। মস্কো শহরের স্থাপত্য তিনভাগে ভাগ করা উচিত। রুশ বিপ্লবের আগে মস্কো শহরের স্থাপত্য ছিল একরকম। সেকালের পুরোনো বাড়িঘর এখনও কয়েকটা পাড়ায় ছড়িয়ে আছে। লেনিন-স্তালিন আমলের স্থাপত্য আরেক ঢং-এর। তার সঙ্গে এখনকার অর্থাৎ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরের স্থাপত্যের মিল নেই। মস্কো শহরের নির্মাণ কাজের শেষ নেই, পরিধিও বেড়ে চলেছে।

মস্কোয় ট্রাম-বাস ও মেট্রোর টিকিট কেনার ঝামেলা নেই। বাসে উঠে বাক্সে নির্ধারিত পয়সা ফেলতে হয়। টিকিট বিক্রেতা ও পরিদর্শকের বালাই নেই। যাত্রীরা সব সময়ে সজাগ, কেউ পয়সা না দিলে যাত্রীরাই তাকে তিরস্কার করে পয়সা আদায় করে বাক্সে ফেলে। এমন ঘটনা আমি নিজের চোখে দেখেছি। একদিন দেখি এক ছোকরা বাসের রড ধরে ঝুলে যাচ্ছে। মস্কোতে বাসের রড ধরে ঝুলে যাবার নিয়ম নেই। যতগুলি যাত্রী ধরে তার বেশী নেয় না ড্রাইভার। পেছনের সিটে এক বুড়ো দাঁত মুখ খিঁচিয়ে বলছিল

ওই ছোকরাকে, কিরে পয়সা দিয়ে টিকিট নিলি না যে? ছেলেটা উত্তর দেয়, মা পয়সা দিয়েছিল, আমি সব খেয়ে ফেলেছি। তাই বাসের ভেতরে যাচ্ছি না। বুড়ো বললে, এইভাবে পয়সা না দিয়ে বাসে চড়লে আমাদের বাস কোম্পানীর লোকসান হবে। তা বুঝিস না। ছেলেটিও নাছোড়বান্দা, সে বলে—কি করব? পয়সা নেই, কিন্তু বাড়ি যেতে হবে তো? বচসার মধ্যে যোগ দিলেন এক ভদ্রমহিলা। তিনি বললেন, অত ঝগড়ার কি দরকার বাপু এই নাও আমি তোমার পয়সা দিয়ে দিচ্ছি। খানিক বাদে ছেলেটা বাস থেকে নেমে গেল। যাবার সময়ে সেই ভদ্রমহিলাকে অশেষ ধন্যবাদ জানিয়ে গেল। কিন্তু সেই বুড়ো গজর গজর করেই চলল।

মেট্রো বা সুড়ঙ্গ পথে বিনা পয়সায় চড়বার জো নেই। সেখানে টিকিটের ব্যবস্থা নেই। স্টেশনে গেটের কাছে একটি স্বয়ংক্রিয় দরজা আছে তার সামনে জ্বলছে ইলেকট্রনিক আলো। একটি গর্তে পাঁচ কোপেকের মুদ্রা দিলেই হল। পয়সা না দিয়ে যেতে গেলেই একটা লোহার ডাণ্ডা এসে পায়ের সামনে এসে ধাক্কা মারবে। অনেক সময়ে এই লোহার ডাণ্ডা পায়ে বেশ জোর আঘাত দেয়। অন্য যাত্রীরা তাই দেখে ঠাট্টা-তামাসা করে। সাধারণতঃ যারা জানেন না তারাই করেন, তাছাড়া অনেক সময় ভুলে যান পয়সা দিতে। এখানে ফাঁকি দেওয়ার উপায় নেই।

আয়তনে ও লোক সংখ্যায় বিরাট শহর মস্কো। কিন্তু সেই তুলনায় কাফে-রেস্তোরাঁ তেমন নেই। অনেকে আড্ডার জায়গা খুঁজে না পেয়ে মস্কোর রাস্তায় বেড়াতে বেরোয়। মস্কো শহরের এটাই সবচেয়ে বড় দুর্বলতা। মস্কোবাসীরাও একথা স্বীকার করেন।

মস্কোয় গীর্জার সংখ্যা প্রচুর। তাদের অধিকাংশই তালা বন্ধ। বিপ্লবের পর আর কোনো নতুন গীর্জা নির্মিত হয়নি। যা হয়েছে সবই জারদের আমলে। সোকেলানিকি পার্কের কাছে একটি পুরোনো গীর্জার ভিতরে দেখলাম বেশ কয়েকজন বৃদ্ধ-বৃদ্ধা মোমবাতি জ্বালিয়ে পুজো করছে। একজন পুরোহিত মন্ত্র পড়ছে। এই গীর্জায় আমি একজন তরুণ-তরুণীকেও দেখলাম না। আজকাল রুশ সরকার আগের তুলনায় অনেক উদার বলে দু-চারটে গীর্জায় উৎসব-পার্বণে উপাসনা করে থাকেন বৃদ্ধের দল। গীর্জা দেখাশোনা করে সরকারী কর্মচারী। অধিকাংশ অর্থভক্ষ্য রুশ গীর্জার ভেতরে ভাস্কর্য ও চিত্রপটগুলো রুশ লোকশিল্পের ঐতিহ্য বহন করে চলেছে। শিল্পের দিক থেকে এগুলো মনোরম। এবং অনেক

চিত্রপট দেখার মতন

আয়তনে বিশাল সোভিয়েত ইউনিয়নে কোনো রাষ্ট্রের সঙ্গে কোনো রাষ্ট্রের মিল নেই। জলবায়ু-আবহাওয়া, মানুষের চেহারা ও সংস্কৃতি অমিল বলেই একটি রাষ্ট্রের মানুষের চেহারার সঙ্গে আরেক রাষ্ট্রের মানুষের অনেক ফারাক। মনের মিলও নেই। এবং সেটা না থাকাই স্বাভাবিক। কিন্তু তারা সবাই একটি বিষয়ে একমত। সোভিয়েত ইউনিয়নের ঐক্য প্রশ্নে সবাই এক। নিজেদের মধ্যে প্রাদেশিক মনোভাব থাকা সত্ত্বেও সোভিয়েত রাষ্ট্রসংঘের প্রতি তাদের শ্রদ্ধা ও মমত্ববোধ সমানভাবে সজাগ। প্রদেশে প্রদেশে প্রতিযোগিতা আছে বলেই সেখানে বৈচিত্র্য চোখে পড়ে।

একদিন মস্কোয় এক ট্যাক্সি ড্রাইভারের কাছে শুনলাম, সে নিজে জর্জিয়ান এবং জর্জিয়ান হিসেবে তিনি গর্বিত। তার গর্বের বিষয় আরও এজন্যে যে স্তালিন ছিলেন জর্জিয়ার মানুষ। স্তালিন জর্জিয়ার মানুষের কাছে এখনও প্রিয় নেতা বলেই চিহ্নিত। ট্যাক্সি ড্রাইভার বার বার জোর দিয়ে বললে, সে রুশ নয়, জর্জিয়ান। তাকে রুশ বলে যেন ভুল না করি। এমনি মন্তব্য আমি শুনেছি আর্মেনিয়ান, উজবেক অথবা ইউক্রেনিয়ানদের কাছ থেকে। আমার এক ইউক্রেনিয়ান বন্ধু বললেন, ভাল রসাল খাদ্য খেতে হলে ইউক্রেনিয়ায় যাওয়া উচিত। রুশদের চেয়ে ইউক্রেনিয়ানরা ভাল খায়-দায় ইত্যাদি।

মস্কোর এক ছোট পার্কের খোলা কাফেতে বসে একদিন কফি পান করছি, এমন সময় দুই জিপসী মহিলা এসে বললে, তুই তো সাদা চামড়ার রুশ বা ইউরোপীয় নস্। মনে হচ্ছে আমাদের জাতের লোক। আয় তোর হাত দেখে সব বলে দিচ্ছি। ঠিক এই সময়ে এক পুলিশ পাশ দিয়ে যাচ্ছিল, সে আমাদের দেখেই বুঝল আমি বিদেশী, অমনি জিপসীদের ভাগিয়ে দিল। রাশিয়ায় জিপসীদের আয়ত্তে আনতে রুশ সরকার হিমসিম খাচ্ছে। জিপসীরা কিছুতেই তাদের যাযাবর বৃত্তি পরিত্যাগ করতে চায় না। তবে বহু জিপসী এখন 'ভদ্র' হয়ে অন্যদের মতন সাধারণ জীবন যাপন করছে। মস্কোয় রয়েছে বিশ্বের একমাত্র জিপসী থিয়েটার। মস্কোর জিপসী থিয়েটারে দেখানো হয় জিপসী নাচ, গান ও নাটক। দর্শকদের ভিড়ও জমে।

মফঃসলের লোকজন যেমন মস্কো বেড়াতে আসে তেমনি আসে বহু জিপসী। জিপসীরা আইনের কড়াকড়ি পছন্দ করে না। তারা যাযাবর। একটু ফাঁক পেলেই বেরিয়ে পড়ে। গ্রীষ্মকালে মস্কোর পার্কে পার্কে ঘুরে বেড়াতে

দেখা যাবে জিপসী মেয়েদের রঙবেরঙের পোষাক পরে। স্থায়িভাবে বসবাসের ইচ্ছে এদের মধ্যে সত্যি কম। এদের জন্যে বাসস্থান, কাজ সব রয়েছে কিন্তু এরা ওর মধ্যে নেই। ঘুরে বেড়াতেই এরা ভালবাসে। সমাজতন্ত্রবাদ এখনও ওদের চিন্তার বাইরে।

## পাঁচ বছর আগে যা দেখেছি

রুশ-বিপ্লবের পঞ্চাশ বছর পূর্ণ হল ১৯৬৭ সালের নভেম্বর মাসে। ১৯৬৭ সালের গ্রীষ্মকালে আমার দ্বিতীয়বার সোভিয়েত ইউনিয়ন পরিদর্শনকালে পথে-ঘাটে দেখেছি রুশ-বিপ্লবের অর্ধ শতাব্দী উৎসব পালনের আয়োজন। এক কথায় বলা চলে তখনই উৎসবের শুরু। সেবার মস্কোর আন্তর্জাতিক ফিল্ম ফেস্টিভ্যালও খুব জাঁকজমকের মধ্যে পালিত হয়েছিল। দেশ-বিদেশের দর্শকে সোভিয়েত দেশ এখন মুখরিত।

সোভিয়েত ইউনিয়ন লুক্সেমবুর্গ বা নেপালের মতন ক্ষুদ্র রাষ্ট্র নয়। আয়তনে ভারতের চার-পাঁচগুণ বড়। এ যাত্রায় আমি তার সামান্যতম অংশই ঘুরে দেখেছি। আমি বরাবর ট্রেন যাত্রী। পোল্যাণ্ড ও বেলোরাশিয়ার সীমান্ত ব্রেষ্ট রেলস্টেশন থেকে আরম্ভ করে মস্কো পর্যন্ত জনপদগুলো দ্বিতীয়বার দেখা গেল। আর দেখেছি মস্কো থেকে লেনিনগ্রাদ যাবার পথে উত্তরাঞ্চলগুলো। ব্রেট স্টেশনে ট্রেন থামে আড়াই ঘণ্টা। দুই খেপে যা সময় হাতে পেয়েছি তারই মধ্যে স্টেশনের আশেপাশে চোখ-কান খুলে দেখেছি। মস্কো যাবার পথে একবার নেমেছিলাম স্মোলনেস্ক-এ। এই নগরীর জনপদে চারিধারে খালি পোষ্টার আর পোষ্টার, দেওয়ালের গায়ে লেখা দেখেছি রুশ বিপ্লবের পঞ্চাশতম বার্ষিকী উদ্‌যাপন উপলক্ষে নানা শ্লোগান। সোস্যালইজমের অর্ধ-শতাব্দী। নভেম্বরে উৎসব। তারই প্রস্তুতি চলছিল তখন সমগ্র সোভিয়েত ইউনিয়ন জুড়ে।

সোভিয়েত ইউনিয়নে আজকাল বহু বিদেশী বাস করেন। সোস্যালিজম্‌ কতদূর কৃতকার্য হল তার হিসেব রাখতে ব্যস্ত তাদের অনেকেই। সবার মুখে এক কথা সমাজতন্ত্রবাদ কতদূর এগুলো, কম্যুনিজম্‌ আরও কতদূর ইত্যাদি।

বিদেশের বহু রাজনৈতিক দল তাকিয়ে আছে সোভিয়েত ইউনিয়নের দিকে। সোভিয়েত ইউনিয়নে সমাজতন্ত্রবাদের সফলতার ওপর নির্ভর করছে বহু রাষ্ট্রের রাজনৈতিক দলের। সমাজতন্ত্রবাদের পরীক্ষা-নিরীক্ষা শুরু হয়েছে রাশিয়ায়। তাই তার ফলাফল জানতে উৎসুক বিশ্বের অধিকাংশ রাষ্ট্র। এমনকি রাশিয়ার শত্রু রাষ্ট্রগুলো পর্যন্ত। রুশ বিপ্লব বিশ্বের ইতিহাসের নতুন অধ্যায় খুলে দিয়েছে। সে অধ্যায়ের পাঠ এখানে শেষ নয়, শুরু।

সোভিয়েত ইউনিয়নে গত পঞ্চাশ বছরে বৈষয়িক নীতির কিছু অদল-বদল হয়েছে। পররাষ্ট্রনীতির অদল বদল হয়েছে গত পঁচিশ বছরে কয়েকবার। ভবিষ্যতে হয়ত আরও হবে। রাজনীতি কখনও সনাতন ধর্ম নয়। বরং পরিবর্তনশীল। দেশের স্বার্থে অনেককেই রাজনৈতিক পট পরিবর্তন করতে হয়। স্তালিনবাদের সমাপ্তি ঘটেছে স্তালিনের মৃত্যুতে। কিন্তু ক্রুশ্চভের বিদায় গ্রহণের পরও শান্তিপূর্ণ সহবস্থান নীতি সেখান থেকে বিদায় নেয়নি। পররাষ্ট্রনীতির কিছু অদল-বদল হয়েছে। যেমন বিগত দুই দশকে সোভিয়েত ভারত সম্পর্ক উত্তরোত্তর বৃদ্ধিই পেয়েছে। বন্ধুত্ব আরও দৃঢ়তর হচ্ছে।

১৯৬৭ সালের গ্রীষ্মকালে যখন আমি রাশিয়ায়, তার দুমাস আগে আরব-ইস্রায়েল যুদ্ধ হয়ে গেছে। আরবদের হার হয়েছে। ইস্রায়েলের জয় হয়েছে। আরবদের সাহায্য করেছিল রাশিয়া। এত সামরিক সাহায্য পেয়েও আরবরা পরোক্ষে রাশিয়াকে সমালোচনা করেছিল। তারই জের দেখলাম রাশিয়ায়। রুশদের অস্ত্র নিয়ে অনেক দেশ যুদ্ধে জিতেছে। যেমন ভিয়েতনামে কিন্তু ইস্রায়েল যুদ্ধে আরবেরা হেরে গিয়ে রুশ অস্ত্রের দোষারোপ করে। বহু রুশদের বিরক্ত প্রকাশ করতে দেখেছি। আরব-ইস্রায়েল লড়াই নিয়ে সোভিয়েত নেতৃস্থানীয়-দের মধ্যে পরিবর্তন আসে। আরব-ইস্রায়েলের যুদ্ধে আরবদের পরাজয়ের কারণ তারা রুশ সমরাস্ত্র ঠিক মত ব্যবহার করতে পারেনি বা জানত না বলে। তার জন্যে রুশ সরকারকে দোষারোপ করার কোনো যুক্তি নেই। যাইহোক এই যুদ্ধের পর কম্যুনিস্ট পার্টির প্রধান সম্পাদক ব্রেজনেভের ক্ষমতা আরও বাড়ে। কোসিগিন যেমন প্রধান মন্ত্রী ছিলেন তেমনিই থাকেন। তেমনি থাকেন রাষ্ট্রপতি পদগোর্নি। খানিকটা জনপ্রিয়তা কমে তরুণ দলের নেতা শেলেপিনের। এই যা অদল-বদল হয়েছে তার বেশী কিছু নয়।

সোভিয়েত ইউনিয়নে রাজনীতির চেয়েও বড় রকমের পরিবর্তন এসেছে। সমাজতন্ত্রবাদের মূলতন্ত্র সর্বত্রই কার্যকরী হয়েছে। সবার সমান অধিকার।

খাদ্য, শিক্ষা, বাসস্থান, চিকিৎসা, খেলাধূলো ও সাংস্কৃতিক জীবনে সবার জন্যে এক ব্যবস্থা। সেখানে কোনো পার্থক্য নেই। কিন্তু আমাদের দেশের টাকার মূল্যে কোনো জিনিষের দাম নির্দ্ধারণ করতে গেলেই যত গণ্ডগোল। পণ্য-দ্রব্যের গুণাগুণের ওপর দাম নয়। কোয়ানটিটি ও কোয়ালিটির ওপর দাম নির্ভর করে না। যেমন জামাকাপড়ের দাম বেশী কিন্তু খাদ্য ও ওষুধের দাম সাংঘাতিক রকমের কম। সোভিয়েত সরকার এখন নতুন অর্থনীতির দিকে ঝুঁকেছে। অধ্যাপক লিবারম্যানের 'লাভ-লোকসান' নীতি সমানভাবে চালু করা হয়েছে। এটা ঠিক পুঁজিবাদের 'লাভ-লোকসান' নীতি নয়। লিবার-ম্যান নীতি অনুযায়ী উৎপাদন ক্ষেত্রে প্রতিযোগিতা আনা হয়েছে। প্রতি-যোগিতা থাকলে উৎপাদনের উৎকর্ষতা বাড়বে। এবং যদি 'লাভ' হয় তাহলে সেই 'লাভের টাকা, ওই কারখানার শ্রমিকদের মধ্যে বেঁটে দেওয়া হবে। অর্থাৎ শ্রমিকরা তাদের কাজের প্রতি আরও সজাগ হবেন। তাদের দায়িত্ব আরও বেড়ে গেছে। যদিও সবই সরকারের মালিকানা, তা সত্ত্বেও বিভিন্ন কলকারখানা ও বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানে 'স্বায়ত্ব শাসন' গোছের ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে। ফলে প্রতিটি কারখানায় ও বাণিজ্য প্রতিষ্ঠানে শ্রমিক-কর্মচারীরা নিজের 'লাভ-লোকসান' বুঝবে।

সোভিয়েত সরকার ও জনগণ যুদ্ধ চায় না। তার প্রধান কারণ দুটো। প্রথমতঃ বিদেশী আক্রমণ প্রতিরোধ করার মতন শক্তি ও পর্যাপ্ত পরিমাণে সমরাস্ত্র ও রসদ আছে। সেদিক দিয়ে এরা প্রস্তুত। পরের ওপর এদের নির্ভর করতে হয় না। সুতরাং খামাখা একটা যুদ্ধ বাধিয়ে নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিষের উৎপাদন কমিয়ে লাভ কি? দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে এরা ভীষণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল। তার জের হিসেবে গৃহ সমস্যা এখনও চলছে। দেশে শান্তি বিরাজ করলে নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিষের উৎপাদন আরও বাড়বে। জনসাধারণের সুখ-সমৃদ্ধি আরও বাড়বে। এটাই চান সোভিয়েত সরকার। একথা খাটে ভারতের বেলায়ও। শান্তিপূর্ণ আবহাওয়া বজায় থাকলে ভারতেও আর্থিক সমৃদ্ধি বাড়বে। দেশের লোক সুখে থাকতে পারবে।

সোভিয়েত ইউনিয়নে বহুকাল ছিল গৃহসমস্যা। সেদিকে বিশেষ দৃষ্টি দিয়েছে বর্তমান সরকার। নতুন নতুন দেশলাই বাক্সের প্যাটার্ণে বাড়ি নির্মিত হচ্ছে শহরাঞ্চলে। যে পরিমাণে শহরাঞ্চলে নতুন বাড়ি নির্মিত হচ্ছে ঠিক সেই পরিমাণে পাকা দালান নির্মিত হয়নি গ্রামাঞ্চলে। গ্রামবাসীরা এতে সন্তুষ্ট

ছিলেন না বলেই ক্রুশ্চভকে বিদায় নিতে হয়েছিল। তাই বর্তমান নেতারা অর্থনৈতিক উন্নয়নের দিকে এত ঝুঁকেছেন। তাঁরা চান ব্যণিজ্য ফেঁপে উঠলে গৃহ সমস্যা থেকে আরম্ভ করে গ্রামীন সমস্যাও মিটবে। তাঁরা চান অধিক উৎপাদন ও বিদেশে রপ্তানি। বিদেশে যতবেশী রপ্তানি বাণিজ্যের বহর বাড়বে ততই বাড়বে বিদেশী মুদ্রার্জন। তাঁরা চান আরও ডলার ও পশ্চিম ইউরোপীয় মুদ্রা। এই কারণে বিদেশী ট্যুরিস্টদের সোভিয়েতে দেশে বেড়াতে প্রলুব্ধ করা হচ্ছে। তাঁদের এক কথা ব্যবসা-বাণিজ্যের বহর বাড়াও। তাহলে অর্থনৈতিক উন্নতি হবে আরও দ্রুতগতিতে।

অনুন্নত রাষ্ট্রগুলোতে এরা যেমন সাহায্য দিয়ে আসছেন সেটা তেমনি চালিয়ে যেতে চান এবং সেই সঙ্গে তাঁরা চাইছেন ওইসব দেশের সঙ্গে আরও ব্যবসা-বাণিজ্য। ভারতও তার বাইরে নয়। এই কারণেই ভারতের সঙ্গে সোভিয়েত ইউনিয়নের বাণিজ্য বাড়ছে। অনেক সময়ে বাণিজ্যের ব্যাপারে অনেক পরিবর্তন হয়। যেমন হয়েছে সম্প্রতি পূর্ব ইউরোপের কয়েকটি রাষ্ট্রের সঙ্গে। কিছুদিন আগে ভারত সরকার এক বিজ্ঞপ্তিতে জানায়, পূর্ব ইউরোপের কয়েকটি দেশের সঙ্গে ভারতের বাণিজ্য কমেছে একটা কারণে, তারা ভারত থেকে কাঁচা মাল কিনে পশ্চিমী দেশে বেচে ডলার অর্জন করেছে। এখন ভারত সরকার সরাসরি পশ্চিমী দেশে ওইসব কাঁচা মাল বেচে ডলার অর্জন করছে। ফলে ওইসব কাঁচা মালের রপ্তানি বাণিজ্যে পূর্ব ইউরোপের সঙ্গে ভারতের বাণিজ্য বহর কমেছে।

সোভিয়েত সরকারের পশ্চিমী মুদ্রা ও আমেরিকান ডলার অর্জনের অনেক উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে। মস্কো কেন যে কোন বড় বড় শহরের বড় হোটেলে এবং 'বিরিওজ্‌কা' নামে দোকানে বিদেশীদের বিদেশী মুদ্রার বিনিময়ে এবং অনেক সস্তা দামে সৌখিন উপহার দ্রব্য বিক্রি হয়। ক্যামেরা, ঘড়ি, মাদকদ্রব্য, কাভিয়ার ও অনেক জিনিস অতি সস্তা দামে বেচা হয়। পশ্চিমের অর্থ ও ডলার ছাড়া অন্য কোনো কম মূল্যের মুদ্রা বা সমাজতান্ত্রিক দেশের মুদ্রায় ওসব জিনিস বেচা যায় না। সব সমাজতান্ত্রিক দেশে ওই একই ব্যবস্থা।

সোভিয়েত সরকার যা উদারনৈতিক অর্থনীতি গ্রহণ করেছেন তার উদাহরণ স্বরূপ বলা যেতে পারে যেমন সম্প্রতি ইতালির সঙ্গে তাদের বাণিজ্য চুক্তিতে, ইতালির ফিয়াট গাড়ি কোম্পানী মস্কোর কাছে একটি কারখানা

মতন গ্রামগুলো তেমন উন্নত নয়। পূর্ব জার্মানীর কম্যুনিষ্ট সরকার সব জমি যৌথখামার ও সরকারখামারের আয়ত্তে আনতে চেষ্টা করছে। খামারে দেখেছি শ্রমিকদের জন্য দালান কোঠা, ক্লাবঘর, ইস্কুল, চিকিৎসালয় ইত্যাদি।

পূর্ব জার্মানীর ফ্রাঙ্কফুর্ট আম ওডার শহর যেখানে শেষ হয়েছে তার কিছু পরেই সুরু পোল্যাণ্ডের সীমানা। পোল্যাণ্ডের এই সীমানা থেকে পোজনান শহর পর্যন্ত সমস্ত গ্রামাঞ্চলের হাবভাব বাড়ি ঘরের নক্সা পূর্ব জার্মানীর মতন। এই অঞ্চলের গ্রামের বাড়িগুলো সবই পাকা নয় কিছু কাঠেরও। গ্রামাঞ্চলগুলো একেবারে অজপাড়াগাঁ নয়। পোজনান থেকে বেলোরাশিয়ার সীমান্ত পর্যন্ত পোল্যাণ্ডের এই অঞ্চলে গ্রামের দৃশ্য দেখে অবাক হয়েছি। মনে হয়েছে যেন উত্তর ভারতের পার্বত্যঅঞ্চলে ঘুরে বেড়াচ্ছি। পূর্ব পোল্যাণ্ডের গ্রামাঞ্চলে এখনও দেখতে পাওয়া যাবে খড়ের চাল দেওয়া ঘর-বাড়ি। কৃষকদের পোষাকে-আশাকে নেই কোনো বিলাসিতার চিহ্ন। পোল্যাণ্ডে যৌথখামারে ও সরকারী খামারে নির্মিত হচ্ছে দালান কোঠা পোলিকা সরকার এখনও সব জমিকে যৌথখামারের আয়ত্তে আনতে সক্ষম হয় নি। স্বাধীভাবে বহু কৃষক চাষ-বাস করে চলেছে। যারা নিজের জমি চাষকরে তাদের বাড়ি ঘরের চেহারা ফেরেনি। পোল্যাণ্ডের গ্রামাঞ্চলে কৃষকদের অবস্থা ভাল নয় বলেই সেখানে গীর্জার প্রাধান্য এখনও আছে। যা নেই রাশিয়ায়। এমন কি বড় বড় শহরে দেখেছি রোমান ক্যাথলিক গীর্জার পুরুতরা বেশ কায়েমি হয়ে বসে আছে। তারা তাদের পুরুতগিরি ব্যবসা চালিয়ে যাচ্ছে। এ দৃশ্য দেখা যাবে না রাশিয়ায়। এমনকি পূর্ব জার্মানী বা বুলগেরিয়ায়।

পোল্যাণ্ড ছেড়ে সোভিয়েত ইউনিয়নের বেলোরাশিয়ায় পৌছে গ্রামাঞ্চল দেখে কিছুটা আশ্বস্ত হয়েছি। রাশিয়ার তুলনায় বেলোরাশিয়া তেমন শিল্পোন্নত নয়। রাশিয়ায় মতন কলকারখানার ছড়াছড়ি নেই। বেলোরাশিয়া কৃষিপ্রধান দেশ। কৃষিজাত দ্রব্যে সমৃদ্ধি লাভ করেছে।.

রাশিয়ার আবহাওয়া বড়ই নির্দয়। শীতকালে আরও কঠোর। তার ওপর জমির উর্বরতা সব জায়গায় সমান নয়। ঐই সব কারণেই রাশিয়ায় কৃষির উৎপাদন অন্য অঙ্গ-রাষ্ট্রের তুলনায় কম। রাশিয়ার তুলনায় ইউক্রেনিয়া, বেলোরাশিয়া বা উজবেকিস্তানের চাষের বহর বেড়েই চলেছে। বেলোরাশিয়ায় গ্রামাঞ্চল পশ্চিম ইউরোপের তুলনায় একটু পিছিয়ে আছে। গ্রামে পাকা দালানের সংখ্যা কম।

বেলোরাশিয়া হতে রাশিয়ার ভেতর দিয়ে মস্কো পর্যন্ত এবং মস্কো হতে লেনিনগ্রাদ যাবার পথে রাশিয়ার গ্রামাঞ্চল দেখে আশ্চর্য হইনি। রাশিয়ার গ্রামাঞ্চলের বাড়ি-ঘরের চেহারা বেলোরাশিয়ার চেয়ে অনেক ভাল। কাঠের বাড়ি ঘরের সঙ্গে দালান কোঠাও আছে। রাশিয়ায় কৃষকদের পোষাকে খুব তফাৎ দেখিনি। এদের মধ্যে কোনো বিলাসিতা নেই। রাশিয়ায় যৌথখামারের সংখ্যা বেশী। যেখানেই যৌথখামার সেখানেই পাকা বাড়ি ঘর। তার সঙ্গে থাকে ট্র্যাক্টর, যন্ত্রপাতি, যানবাহন, বিদ্যালয় ও চিকিৎসালয়। রাশিয়ার পথঘাটের চেহারা বেলোরাশিয়ার চেয়ে অনেক ভাল।

রাশিয়ায় কৃষকদের এখন অনেক বেশী স্বাধীনতা। তারা নিজের অল্প জমিতে ফলমূল চাষ করে খোলা বাজারে বা শহরে গিয়ে বেচে আসে। এতে দু'পয়সা বাড়তি রোজগার হয়। এমন অনেক কৃষকদের আমি মস্কো শহরের বড় রাস্তার ধারে ফলমূল—শাক সব্জী বিক্রি করতে দেখেছি। তারা সাধারণতঃ শনি-রবিবার বা ছুটির দিনে আসে গ্রাম হতে শহরে।

এমনি এক চাষির সঙ্গে আমার আলাপ হয়। নাম তার ঈভ্‌গেনি। সে বললে—যুদ্ধের সময়ে কি দুঃসময় গেছে আমাদের। এখন চাষাবাদে আয় বেড়েছে। সব চাষির সমান সুযোগ সুবিধে। এই দেখুন না আমরা স্বামী-স্ত্রীতে দুজনেই এক খামার বাড়িতে কাজকরি। আমাদের ছেলে লেখাপড়া শিখে সে এখন এঞ্জিনিয়ার। সাইবেরিয়ার এক বিরাট কারখানায় সে ভাল চাকরী করে। ছুটিতে এলে আমাদের সঙ্গে থাকে। তবে ছেলে-ছোকরারা আজকাল ভাল লেখাপড়া শিখে গ্রামে থাকতে চায়না। তারা চলে যায় কলকারখানায়, বড় শহরে।

পৃথিবীর সব দেশেই এক সমস্যা। গ্রামের লোক শহরে ভিড় জমাচ্ছে। আমাদেরও সে রোগ এসে জেঁকে ধরেছে।

## পাঁচ বছর আগে রাশিয়ার কয়েকটি অঞ্চলে

সোভিয়েত ইউনিয়ন সম্বন্ধে বিদেশীদের কৌতূহলের সীমানা নেই। মস্কো থেকে ফেরা মানে উত্তর বা দক্ষিণ মেরু দেখে ফেরার মতন। সবার একই কৌতূহল। কেন এই কৌতূহল? পশ্চিম ইউরোপ ও আমেরিকার সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্রগুলোর বছরের পর বছর সোভিয়েত বিরোধী প্রচারকার্যের ফলে এইসব রাষ্ট্রে জনগণের মনে সর্বদাই কিম্ভূতকিমাকার কৌতূহল। আরেক দল আছেন যারা রাজনীতিতে আদর্শবাদ বিশ্বাস করেন বা পছন্দ করেন। সোস্যালিজম এখনও তাদের কাছে আদর্শবাদ। সোভিয়েত ইউনিয়নে সোস্যালিজম কতখানি সার্থক হয়েছে সে সম্বন্ধে প্রশ্নবাণে জর্জরিত করে এই দল।

দু'বছর পরে মস্কো বা লেনিনগ্রাদে খুব বেশী পরিবর্তন দেখিনি। সোভিয়েত ইউনিয়নে তথাকথিত 'লৌহ-যবনিকা'র অবসান ঘটছে সে বিষয়ে আমি নিঃসন্দেহ। বিদেশী ট্যুরিষ্টের সংখ্যা প্রতি বছরেই বাড়ছে। 'লৌহ-যবনিকা' সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্রগুলোর অপপ্রচার ছাড়া আর কিছু নয়। নতুন যেসব অট্টালিকা নির্মিত হচ্ছে মস্কোয় সেগুলোর প্যাটার্ণ একালের প্যারিস-লণ্ডনের নতুন বাড়ীগুলোর মতনই। অর্থাৎ দেশলাইয়ের বাক্স বা অতি আধুনিক প্যাটার্ণের বাড়ী। মিনি স্কার্ট, লম্বা চুলওয়ালা বিট্‌লসপন্থী রুশ তরুণদের রাস্তায় উপস্থিতি, পার্কে পার্কে ট্যুইষ্ট গাইয়ে ও নাচিয়েদের ভীড় দেখেছি। রাত দুটোর সময় ব্রেষ্ট রেল স্টেশনে পৌছে ঘণ্টা দুই ওখানে অপেক্ষা করতে হয়। রেল স্টেশনে অপেক্ষারত চার-পাঁচটি ছেলেমেয়ে আঁট-সাঁট পোষাকে ট্যুইষ্ট নাচের মহড়া দিচ্ছিল। দেখে মনে হল এরাও পিছিয়ে নেই।

ক্রুশ্চেভের আগে হয়ত এসব সম্ভব ছিল না। ক্রুশ্চেভের পর সোভিয়েত সরকার অনেক দিক দিয়ে আরও উদারনীতি অবলম্বন করেন। বিদেশীদের সঙ্গে খুব বেশী মাখা-মাখি পছন্দ করত না আগের সরকার। এখন সে বিষয়ে কড়াকড়ি কমেছে।

রুশরাও রক্তমাংসের মানুষ। দোষত্রুটি সব দেশেই আছে। তাই বলে সোস্যালিজমকে অপরাধী সাব্যস্ত করা ঠিক হবে না। উদাহরণ স্বরূপ মস্কোর

ট্যাক্সির কথা তোলা যেতে পারে। লোকসংখ্যার তুলনায় ট্যাক্সির সংখ্যা বেশ কম। কখনো কখনো আধ থেকে এক ঘণ্টা অপেক্ষা করতে হয় ট্যাক্সির জন্যে। নাকের সামনে দিয়ে খালি ট্যাক্সির দল চলে যাবে। তাদের ডাকলে উত্তর দেবে গ্যারাজে যাচ্ছে। একদিন সন্ধ্যায় কুলচুরনি পার্কের পাশে ট্যাক্সি ষ্ট্যাণ্ডে এক বন্ধুর সঙ্গে ট্যাক্সির জন্যে অপেক্ষা করছি। খালি ট্যাক্সি চলে যাচ্ছে 'গ্যারেজে'। অনেকেই অপেক্ষমাণ, একটি প্রাইভেট গাড়ী এসে থামল। বলল মিটার নেই বটে তবে ট্যাক্সির মতন কাজ করে। হোটেলে পৌঁছে ভাড়া মিটিয়ে দিলাম। পরের দিন আমার মস্কো বন্ধুরা বললেন—আজকাল সকলেরই পয়সা বাড়ছে, সবাই ট্যাক্সি চড়তে চান। কিন্তু ট্যাক্সির সংখ্যা বাড়িয়েও চাহিদা মেটান যাচ্ছে না। তাই এই ট্যাক্সির বিভ্রাট।

মস্কো ও লেনিনগ্রাদের মধ্যে তফাৎ বিস্তর। রুশ বনেদি সমাজের অভিজাত্যের ছাপ দেখা যাবে এখনও লেনিনগ্রাদে। নগরীর প্রভাবে নগরবাসীর মনোভাবও গড়ে উঠেছে অন্যভাবে। মস্কোবাসীদের সঙ্গে এদের এখানেও ফারাক। মস্কোর ট্রামে-বাসে-মেট্রোয় সর্বত্র ঠেলাঠেলি। লেনিনগ্রাদে তেমন নেই; লেনিনগ্রাদবাসীরা মস্কোর তুলনায় অনেক শান্ত ও মার্জিত। লেনিনগ্রাদ পুরোপুরি রুশ শহর। মস্কো তা নয়। সমস্ত সোভিয়েত ইউনিয়নের বিভিন্ন রাজ্যের বিভিন্ন ভাষী ও জাতির দল মস্কোয় ভীড় করেছে।

একালের রুশ সমাজে পারিবারিক বন্ধন অনেকখানি শিথিল হয়েছে। সমাজে ব্যক্তিস্বাধীনতা অত্যন্ত প্রখর। ফলে বিয়ে হয় বেশ অল্প বয়সে এবং বিবাহ বিচ্ছেদও হয় খুব তাড়াতাড়ি। তবে সোভিয়েত ইউনিয়নে অনাথ বালক-বালিকার সঙ্গে বিদেশী বুর্জোয়া সমাজের অনাথদের সঙ্গে তুলনা করা চলে না। বিদেশী বুর্জোয়া সমাজে অনাথরা সারা জীবন অনাথই রয়ে যায়। সোভিয়েত ইউনিয়নে সবার সমান অধিকার। 'মেরিট' অনুযায়ী সমাজে বা কর্মস্থলে তার আধিপত্য। সেখানে অনাথ বা অন্যদের কোনো পার্থক্য নেই।

সোভিয়েত সমাজে ব্যক্তিস্বাধীনতা বাড়ছে মূলতঃ একটি কারণে। ছেলেমেয়ে বুড়ো-বুড়ি সবাই খাটছে। রোজগার করছে। বেকারি অভাব-অনটন, দুর্ভিক্ষ বা বিনা চিকিৎসায় মারা যাবার দুর্ভাবনা নেই। কেউ অন্যের ওপর নির্ভর করে না। ফলে সুখ স্বাচ্ছন্দের মাত্রা বেড়েই চলেছে।

সোভিয়েত ইউনিয়নে সমাজতন্ত্র যত পরিবর্তনই আসুক না কেন জনসাধারণের অতিথিপরায়ণতা বদলাতে পারে নি। রুশরা খেতে ও পান

করতে ভালবাসে এবং তারা অন্যদের খাওয়াতে ও পান করাতে ভালবাসে। কোনো একটা উপলক্ষ্য হলেই হল। ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধরে এদের আমি খেতে ও পান করতে দেখেছি। এব্যাপারে জর্জিয়ানরা সবার ওপরে। জর্জিয়া ছোট রাজ্য, কিন্তু কৃষি উৎপাদনে সবার ওপরে। গ্রীষ্মকালের শেষে শরৎকালে যখন মস্কোয় শাকসব্জি কমে যায় ফলটল প্রায় বাজার থেকে হয় উধাও, তখন কোনো জর্জিয়ান এইসব জিনিষ নিয়ে সোজা চলে আসে বিমানযোগে মস্কোয়। মস্কোয় নেমে চড়া দামে বেচে বেশ কিছু পয়সা রোজগার করে এরা রেস্তোরাঁয় খানা-পিনা সেরে কয়েকদিন ফুর্তি করে দেশে ফেরে।

সেদিক দিয়ে আর্মেনিয়ানরা চৌকশ। আর্মেনিয়া অপেক্ষাকৃত দরিদ্র দেশ। কিন্তু আর্মেনিয়ানরা ভীষণ চতুর। সোভিয়েত আকাডেমিতে আর্মেনিয়ান সভ্য সংখ্যা বিস্তর। বিজ্ঞানী ও আবিষ্কারকদের মধ্যে আর্মেনিয়ানদের সংখ্যা যেমন প্রচুর তেমনি সংস্কৃতি জগতে। সঙ্গীত মহলে এদের প্রাধান্য কম নয়।

সোভিয়েত এশিয়ার উজবেক, কাজাক, আজারবাইজান, তুর্কমেনস্তানের অধিবাসীদের সঙ্গে আলাপ করে সব সময়ে মনে হয়েছে যেন উত্তর ভারতের লোকজনের সঙ্গে আলাপ করছি। ভারতীয় মনোভাব পাওয়া যাবে এদের মধ্যে। মনে হবে না বিদেশীর সঙ্গে আলাপ করছি। অতিথি সেবায় এদের জুড়ি নেই। ভাষা না জানা থাকায় যা মুশকিল। এদের কেউ কেউ অল্প ইংরেজী বা ফরাসী জানে। তাই নিয়ে মহা হৈ চৈ। একদিন মস্কোর উজবেক রেস্তোরাঁয় আলাপ এক উজবেক শিল্পীর সঙ্গে। তিনি ভারতে গিয়েছিলেন। ব্যস! খানা-পিনার পর্ব শুরু হয়ে গেল। যেন কতকালের আত্মীয়তা। তিনি আরেক উজবেক যুবককে পাকড়াও করে নিয়ে এলেন। ছেলেটি মাস দেড়েক হল ভারত থেকে ফিরেছে। হায়দরাবাদে হিন্দী-উর্দু শিখেছে। ব্যস, হিন্দী-উর্দুতে কথা আর পাঞ্জাবী-কাশ্মীরের খানা আরও জোরে চলতে লাগল। রেস্তোরাঁর ফটক বন্ধ না হলে আমরা বোধ হয় সারা রাত ওখানেই থেকে যেতাম। তারা আমায় নেমন্তন্ন করল তাসখন্দে যাবার জন্যে। যেন কতকালের আত্মীয়তা। সোভিয়েত এশিয়ার জনগণ ভারতকে সত্যি ভালবাসে। মনে হবে যেন আমাদের প্রতিবেশী রাষ্ট্র। তাদের সঙ্গে আমাদের বন্ধন আরও দৃঢ় হওয়া উচিত।

আরেক দিনের ঘটনা বলি। মস্কোর রেড স্কোয়ারে বেড়াচ্ছি। লেনিনের

সমাধির সামনে দেখি মধ্য এশিয়ার এক ভদ্রলোক। মাথায় তার কারুকরা টুপি। আমায় দেখে বললেন—ইন্দিস্কি? অর্থাৎ ভারতীয়? আমি উত্তরে বললাম হ্যাঁ—ইন্দিস্কি। আমার রুশ ভাষায় জ্ঞান অতি সামান্য। যা বুঝলাম সংক্ষেপে তা হল এই—তাজিকস্তান থেকে মস্কো বেড়াতে এসেছি। সঙ্গে অনেক আপেল এনেছি আমার গ্রামের।

পকেটে তার বেশ কয়েকটা আপেল ছিল। পকেট হাতড়ে আমায় একটা আপেল দিলেন সেই ভদ্রলোক। বললেন—তাজিকস্তানের আপেল একটা খেয়েই দেখুন। ভদ্রলোকের কথা বার্তায় মনে হল যেন কতকালের পরিচয়। আমি আপেল নিতে বাধ্য হলাম এবং তাঁর সামনেই আপেলে দাঁত বসিয়ে দিলাম। এখানে আপেলের চেয়েও বড় হল তাজিকভদ্রলোকের হৃদ্যতা। আমি ভারতবাসী বলেই তিনি আমায় কাছের মানুষ হিসেবেই আপেলটা দিয়েছিলেন। সোভিয়েত ইউনিয়নের মধ্য এশিয়ার জনগণ আমাদের খুব নিকট আত্মীয় বলেই মনে করেন। ভারতের প্রতি তাঁদের শ্রদ্ধা সত্যিকারের সে বিষয়ে আমার কোনো সন্দেহ নেই।

## বারশ হ্রদের দেশ এস্তোনিয়া

বিচিত্র দেশ সোভিয়েত ইউনিয়ন। সোভিয়েত ইউনিয়নের পনেরোটি রাষ্ট্রের আয়তন, লোকসংখ্যা, ভাষা ও সংস্কৃতির বৈচিত্র্যই তার বৈশিষ্ট্য। উত্তর পশ্চিমে বাল্টিক সমুদ্রের তীরে এস্তোনিয়া, ল্যাটাভিয়া ও লিথুনিয়ার সঙ্গে দক্ষিণের জর্জিয়া বা আর্মেনিয়াব কোনোই সাদৃশ্য নেই। সব দিক থেকেই ফারাক। সোভিয়েত ইউনিয়নের বৈশিষ্ট্য বোধ হয় এখানেই।

ছোট্ট দেশ এস্তোনিয়া। লোক সংখ্যা তের লাখ। স্ক্যাণ্ডিনেভিয়ান দেশের লোকগুলোর মতন চেহারা, হাবভাব, শহরের স্থাপত্য নিদর্শন পর্যন্ত। অধিকাংশের চেহারা লম্বা, মাথার চুল সোনালী। ভাষা ফিন্ গোষ্ঠীর। এস্তোনিয়ার ওপর অনেক ধকল গেছে গত এক হাজার বছর ধরে। জার্মানী ডেনমার্ক ইত্যাদি প্রতিবেশী রাষ্ট্র এই ছোট্ট দেশের ওপর প্রায়ই হামলা করত। ১৯৪০ সালে ২১শে জুলাই এস্তোনিয়া সোভিয়েত ইউনিয়নে যোগদান করে।

এস্তোনিয়া ছোট্ট দেশ হলে হবে কি, যন্ত্রশিল্পে খুবই উন্নত। জাহাজ নির্মাণ কারখানা, বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতির কারখানা, তৈল শোধনাগার, টেক্সটাইল, কাগজ ও কাগজের মণ্ড ইত্যাদির কারখানা অনেক। বনজ সম্পদ প্রভূত থাকায় কাঠ থেকে এদের আয় অনেক। এস্তোনিয়ানরা 'মাছ খেকো জাত। ছোট বড় জাহাজে এরা মাছ ধরে প্রচুর। টিন ভর্তি মাছ যায় বিদেশে। তালিন শহরের বন্দরে মাছ ধরার জাহাজের ভীড়। বন্দরের ধার দিয়ে বয়ে গেছে পিরিতা নদী। জুলাই মাসের রোদে পিরিতা নদীর জল উষ্ণ। নদীর তীরে রৌদ্রস্নান করতে দেখলাম হাজার হাজার নর-নারীকে।

এস্তোনিয়ার রাজধানী তালিন। তিন লাখ লোকের শহর। তালিনের আশে-পাশে শিল্প নগরী, কলকারখানা। হেলসিংকি থেকে জলপথে তালিনের দূরত্ব আশী মাইল। হেলসিংকির ছোঁয়া ওখানে দেখলাম। ছিমছাম শহর। বাড়ী ঘরের স্থাপত্য নিদর্শন জার্মানদের মতন।

তালিনের নতুন হোটেলটি বাইশ তলার। নাম হোটেল 'ভীরু'। এই হোটেলের ঘরের দেয়াল মোড়া চট দিয়ে। কলকাতায় চট দিয়ে থলে হয়। কিন্তু এরা চটকে এমনভাবে দেয়ালে সেঁটে দিয়েছে মনে হবে যেন 'র-সিল্কে' মোড়া।

এস্তোনিয়ায় বিদেশী ট্যুরিষ্টের সংখ্যা বেড়েই চলেছে। স্ক্যাণ্ডিনেভিয়ান ও জার্মান ট্যুরিষ্টই বেশী। আমেরিকান ট্যুরিষ্টের সংখ্যা কম নয়। ট্যুরিষ্টের চাহিদা মেটাতেই হোটেল ভীরুর আবির্ভাব। এই হোটেলটি সর্বাধুনিক এবং এটি নির্মিত হয়েছে ফিনল্যাণ্ড ও এস্তোনিয়ার স্থপতিদের যুগ্ম প্রচেষ্টায়। তালিন শহরের নাইট ক্লাব-ক্যাবারেটি এই হোটেলেই। এদের নাইট ক্লাবে সঙ্গীত ও নৃত্য পরিবেশনায় নতুনত্ব আছে। কিন্তু নোংরামী নেই।

তালিন শহরের ট্রাম-বাস দেখলে হিংসে হয়। কলকাতার তুলনায় কত ছোট শহর। কিন্তু ট্রাম-বাসের সংখ্যা কত বেশী। সব কটাই ঝকঝকে। ট্রামে-বাসে ঝুলে কেউ যায় না।

তালিন শহরের দক্ষিণাঞ্চলে ব্যাংয়ের ছাতার মতন অট্টালিকা গজিয়ে উঠছে। এডুয়ার নামে একটি ছাত্র বলছিল, বছরে হাজার দশেক করে ঘর নির্মিত হচ্ছে তালিনে। তাতেও চাহিদা মিটছে না। তিন ঘরের একটি ফ্ল্যাটের ভাড়া মাসে সত্তর টাকা। গ্যাস-ইলেকট্রিক মাসে পনর টাকা। টেলিফোনের বিল মাসে পনর টাকা।

এক হাজার বছর আগে তালিন নগর গড়ে ওঠে টুম্পিয়া টিলার ওপর। লিণ্ডা নামে এক মহিলা তাঁর স্বামী কালেভের কবরের ওপর মিনার নির্মাণ করেছেন নিজের হাতে। নিজের কাঁধে করে পাথর বয়ে আনতেন বহু দূর থেকে। টুম্পিয়া টিলার ওপর কালেভ মিনার এখনও অটুট হয়ে বিরাজ করছে। এরই ধার দিয়ে নির্মিত হয় প্রথমে দুর্গ। দুর্গের মধ্যে গড়ে ওঠে তালিন শহর। তার বিস্তার হয় কয়েক শতাব্দী ধরে। এখনও দুর্গের ধ্বংসাবশেষ ছড়িয়ে আছে।

ছাত্র বন্ধু এদুয়ার আমায় গল্পচ্ছলে বলছিল, তালিনের নির্মাণ কাজ কখনো শেষ হবে না। কারণ কয়েক শতাব্দী ধরে লিণ্ডা রোজই পাথর সংগ্রহ করে তালিন শহর গড়ছেন। এক বুড়ো রোজ রাত্রে এসে তালিনবাসীদের জিজ্ঞাসা করে, তোমাদের গড়ার কাজ কি শেষ হয়েছে? শেষ হলে সেই বুড়ো নাকি সব উড়িয়ে দেবে। বুড়োকে কাজে ব্যস্ত রাখার জন্যে তালিনবাসীরা কখনো গড়ার কাজে বিশ্রাম নেয় না। সে কাজ এখনও চলছে। লিণ্ডা ও কালেভ এস্তোনিয়ায় ঐতিহাসিক নাম। এতই জনপ্রিয় যে বহু মেয়ের নাম লিণ্ডা ও ছেলের নাম কালেভ।

তালিনবাসীরা চায় বিদেশীরা এসে যেন প্রতি বছর দেখে যায় তালিন শহরের গড়ার কাজ শেষ তো হয়নি বরং বেড়েই চলেছে। শিক্ষিত এস্তোনিয়ানরা ভারত সম্পর্কে অনেক খবর রাখেন। অনেকের সে সম্বন্ধে বেশ কিছু পড়াশোনাও আছে। রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে প্রায় অনেকেই অনেক খবর রাখেন।

এস্তোনিয়ায় মাত্র একটি বিশ্ববিদ্যালয়। রাজধানীতে নয়, তার্তু শহরে। কিন্তু এই বিশ্ববিদ্যালয়ের কলেজ, ইন্সটিট্যুট ও পলিটেকনিক তালিন শহরে। এক-একটি ইন্সটিট্যুট বিশ্ববিদ্যালয়ের এক-একটি বিভাগের মতন বড় ও স্বতন্ত্র। গবেষণার কাজ এখানেই হয়।

বাংলাদেশ সম্বন্ধে প্রায় সবাই উৎসুক। সবাই আরও খবর জানতে আগ্রহ দেখিয়েছে। আমি যখন বললাম যে আমিও বাঙালী কিন্তু বাংলাদেশের নই, পশ্চিমবঙ্গের, তখন তাদের কৌতূহল আরও বেড়ে গেল। বাংলাদেশ সম্পর্কে প্রচুর খবর রাখে জনসাধারণ।

ট্রেনে আলাপ দুই এস্তোনিয়ানের সঙ্গে। একজন হচ্ছে ছোকরা এ্যাডভোকেট। তালিনের কাছে একটি কাপড়ের কারখানার আইন বিভাগের কাজ পরিচালনা করে। তার কারখানায় উৎপাদন নিকৃষ্ট হওয়ায় আরেকটি

ব্যবসা প্রতিষ্ঠান মামলা করে। সে কারখানা পক্ষের হয়ে ওকালতি করতে চলেছে মস্কোয়। এ্যাডভোকেট বলছেন যে, আমরা যে কাঁচা মাল পেয়েছি সেটাই ছিল নিকৃষ্ট। তাই উৎপাদন হয়েছে খারাপ। এই নিয়ে বিভিন্ন ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে মামলা হচ্ছে। কোনো কারখানার উৎপাদন খারাপ হলে সেই কারখানার পরিচালক ও শ্রমিকদের আজকাল জবাব দিতে হয়। সরকারী মাল বলে দরিয়াতে ফেলে দেওয়া চলে না!

একটি কাগজের কারখানার ধনবিজ্ঞানীর সঙ্গে আলাপ হল। তিনি জানালেন, এস্তোনিয়ায় আর্থিক পরিবর্তন ও উন্নতি হয়েছে আগের তুলনায় অনেক। কারখানার উৎপাদনের মান যাতে আরও উন্নত হয় তার জন্যে তাকে নজর দিতে হয়। তার মাইনে মাসে দুশো রুবল। একজন মিনিষ্টারের মাইনে চারশ রুবলের মতন। যিনি যে পেশায় আছেন সে পেশায় যে যত উন্নয়ন আনতে পারবে তার মাইনের ওপর আরও কিছু উৎপাদন ভাতা বাড়িয়ে দেওয়া হয়।

এস্তোনিয়া ছোট্ট দেশ হলেও প্রাকৃতিক সম্পদে ভরা। প্রাকৃতিক সৌন্দর্য তাই দেশটাকে ভরে রেখেছে। বাঁয়ে সমুদ্র, ডাইনে পাহাড়। দেশ জুড়ে বারশ হ্রদ। দেশের আয়তন ও প্রাকৃতিক সম্পদের তুলনায় লোকসংখ্যা খুবই অল্প। কৃষিতে এরা উদ্বৃত্তের দেশ। দুগ্ধজাত দ্রব্যের প্রাচুর্যও অনেক বেশী। তাছাড়া মাছ তো আছেই। ছেলে-মেয়েদের দৈহিক গড়ন বেশ লম্বা-চওড়া। কিন্তু জার্মানদের মতন অতিমাত্রায় নিয়মানুবর্তী এবং একটু ঠাণ্ডা ধরণের। শীতের কাঠিন্যই সম্ভবতঃ তার জন্যে দায়ী। শীতকালে ছ' মাসই বরফের কনকনে ঠাণ্ডা। গ্রীষ্মকালে এবার একটু অতিরিক্ত গরম পড়েছিল। রাত একটায় দেখতাম সন্ধ্যের আলো, রাত আড়াইটা পর্যন্ত ধূসর আলো। তার পরেই দিনের আলো ফুটে বেরুত।

এস্তোনিয়ানদের মেজাজে কাফের প্রভাব দেখা যাবে প্রায় সব শহরেই। তালিন শহরে এখনও কয়েকটি পুরোনো কাফে গত দুশো বছর ধরে চালিয়ে যাচ্ছে। তালিনের কাফেগুলো দেখে প্যারিসের কাফে জীবনের ছবি ভেসে উঠলো। এস্তোনিয়ানরা তাদের স্থাপত্য ভালবাসে বলেই তালিনে এখনও কয়েক শতাব্দীর স্থাপত্য নিদর্শন বাঁচিয়ে রেখেছে। অতি সূক্ষ্ম কারুকার্যের নমুনা দেখা যাবে এইসব বাড়ীতে। এস্তোনিয়ান সরকার ও তালিনের পৌরসভা এগুলো রক্ষণাবেক্ষণ করছেন সুষ্ঠুভাবে।

তালিন শহরের অনেক রাস্তা-ঘাট, বাড়ীঘর প্যারিস বা রোমের পুরোনো পাড়ার চিত্র মনে করিয়ে দেয়। গ্রীষ্মের সন্ধ্যায় বেড়াতে রোমান্টিক ভাব জাগতে বাধ্য। অতি বড় বে-রসিককেও রোমান্টিক করে তুলবে। পার্কে ছড়াছড়ি তালিন শহর। পার্কগুলোতে ফুল বাগিচা, বসবার জায়গা, কোনো হৈ-হট্টগোল নেই। এমনি একটি পার্ককে করা হয়েছে কবরখানা। সাধারণ কবরখানা নয়। যাঁরা ধর্মে বিশ্বাস করে না তাদের ইচ্ছায় এই কবরখানা পার্ক নির্মিত হয়েছে। সনাতন প্রথায় এই পার্কে কবর দেওয়া হয় না। ফল ও ফুলের গাছে ভর্তি, শুধু কয়েকটি ভাঙ্গা ফলক। অধিকাংশই শিল্পীদের হাতে গড়া। এস্তোনিয়ার অধিকাংশ লেখক, চিন্তাশীল, শিল্পীর কবর দেখলাম এখানেই। ওদের খ্যাতনামা লেখক এডুয়ার ভিল্ডের কবরও ওখানে।

তিন লাখ লোকের শহর তালিন। খেলাধূলোর মাঠ ছাড়াও ষ্টেডিয়াম, স্কী দিয়ে ঝাঁপ দেওয়ার জায়গা রয়েছে। আয়তনে ও লোকসংখ্যায় পঁচিশ গুণ কলকাতা কিন্তু তালিনের যা আছে তাও নেই কলকাতায়।

এস্তোনিয়ানরা সঙ্গীতপ্রিয় জাত। এক বছর অন্তর তালিনে বসে আন্তর্জাতিক সঙ্গীত সম্মেলন। রাত জেগে উচ্চাঙ্গসঙ্গীত পরিবেশন হয়। সমুদ্রের ধারে একটি খোলা এ্যাম্পিথিয়েটার—ষ্টেডিয়াম। ষ্টেডিয়ামে লোক বসতে পারে দেড় লাখ লোক। এ্যাম্পিথিয়েটারে একসঙ্গে বসে ঐক্যতানে, গান গায় দশ হাজার গায়ক। এদের মধ্যে অনেকেই বিভিন্ন বাদ্যযন্ত্র বাজায়। দশ হাজার লোকের ঐক্যতানে গান তালিনের আকাশ কেঁপে ওঠে। তার সঙ্গে থাকে মাইক ইত্যাদি। তিনদিন ধরে চলে এই সঙ্গীত সম্মেলন। এস্তোনিয়ার বিভিন্ন জেলা হতে আসে লোকসঙ্গীতপ্রিয়ের দল। আসে ফিনল্যাণ্ড, সুইডেন, নরওয়ে, রাশিয়া, জার্মাণী, পোল্যাণ্ড, লিথুনিয়া, ল্যার্টভিয়া ইত্যাদি দেশের হাজার হাজার গায়ক। তিনদিনের এই সঙ্গীত সম্মেলনের প্রস্তুতির কাজ চলে দু' বছর ধরে। গ্রীষ্মকালে বসে এই সম্মেলন। দেশ-বিদেশের গায়করা তাদের রংচংয়ে পোষাকে ঝলমলে করে তোলে তালিন শহর। এদের থাকবার ব্যবস্থাও করে এই গানের ষ্টেডিয়ামে। সে এক এলাহি ব্যাপার।

তালিন থেকে দক্ষিণে প্যারনু নামে সমুদ্রতীরবর্তী শহরে যাবার পথে এস্তোনিয়ার গ্রামাঞ্চল দেখে মুগ্ধ হয়েছি। প্যারনু তালিন থেকে দুশো কিলোমিটার দক্ষিণে। সমুদ্রতীরে গ্রীষ্মকালে ছুটি কাটাবার শহর। আশী

হাজার লোকের বাস। কিন্তু গ্রীষ্মকালে এখানে আসে আড়াই লাখ স্নানার্থী। আশেপাশে মাছ ধরার বন্দর। মাছ টিনে ভরার কারখানা অনেক।

গিয়ে দেখি ট্যুরিষ্টে ভরে গেছে। সোভিয়েত ইউনিয়নের নানা রাজ্য থেকে এসেছে পর্যটকরা। সমুদ্রের ধারে লোকজনে গিজগিজ করছে। কাফে রেস্তোরাঁ সব ঠাসা।

স্বাস্থ্য ফেরাতে আসে প্যারনুতে। স্যানাটোরিয়াম বা বিশ্রাম কেন্দ্রের সংখ্যা চল্লিশটি। অধিকাংশই ছোট ছোট বাড়ীতে। নতুন একটি স্বাস্থ্য কেন্দ্র নির্মিত হয়েছে। এটিতে আছে একশ ষাটটি ঘর। এটি স্বাস্থ্য কেন্দ্র না দিল্লীর ইন্টারকন্টিনেন্টাল হোটেল, পার্থক্য ধরা মুশকিল। একটা অতি আধুনিক হোটেলের যত রকমের বিলাসিতা, যন্ত্রপাতি, আরাম করার জায়গা, বসবার ঘর, প্রত্যেক ঘরে রেডিও, স্নানের জায়গা, অনেক ঘরে টেলিভিশান। প্রত্যেক তলার বারান্দায় আড্ডা মারার প্রশস্ত জায়গা, বসবার ব্যবস্থা ও টেলিভিশান। অতি আধুনিক চিকিৎসার জন্যে সব রকমের যন্ত্রপাতি, ডাক্তার ও নার্স তো আছেই।

স্বাস্থ্য কেন্দ্রে রয়েছে খেলার মাঠ, নাচ-গানের জায়গা, পড়বার ঘর-লাইব্রেরী, বিরাট রেস্তোরাঁ। ওই স্বাস্থ্য কেন্দ্রের এক তরুণ ডাক্তার আমাদের যখন ঘুরিয়ে দেখাচ্ছিলেন তখন তিনি বললেন, আমরা শুধু চিকিৎসাই করি না। শরীর ভাল রাখতে হলে মনটাও চাঙ্গা থাকা চাই। তাই এইসব সাংস্কৃতিক প্রোগ্রাম করা হয়েছে। যাঁরা এই স্বাস্থ্য কেন্দ্রে আসেন তাঁদের প্রায়ই নিয়ে যাওয়া হয় অপেরা থিয়েটারে অথবা তাদের জন্যে গানের আসরের আয়োজন করা হয়। অনেকে সপরিবারে আসেন। তাদের জন্যেও তিন কামরার স্যুইট দেওয়া হয়। এস্তোনিয়ায় স্ক্যাণ্ডিনেভিয়ান দেশের প্রভাব রয়েছে বলে এখানে সওনা বাথের' ব্যবস্থা রয়েছে। কাঠের ঘরে বাষ্পে স্নান করা হয়। তার সঙ্গে থাকে গাছ-গাছড়ায় সেদ্ধ করে গায়ে মাখা। অনেক রোগ সারে এই চিকিৎসায়। তরুণ ডাক্তার সব দেখিয়ে আমাদের বললেন, সব চিকিৎসার ব্যবস্থা তো দেখলেন এবার চলুন বার থেরাপি দেখতে। রসিকতা করে বললেন, দেখছেন এই কাফ-বার। অবসর সময়ে যে কেউ এসে এখানে কফি বা মদ্যপান করতে পারে। এরই নাম বার থেরাপি। এই রাজকীয় বিশ্রামাগারে চব্বিশ দিন চিকিৎসা ও বিশ্রামের জন্য একটি পয়সাও ব্যয় করতে হয় না। যিনি যে প্রতিষ্ঠানে কাজ করেন সেখানকার ট্রেড ইউনিয়নের সুপারিশ পেলেই এখানে

দিনে পয়সায় থাকতে পারেন। তবে কেউ যদি বিনা সুপারিশে পয়সা দিয়ে থাকতে চান তাহলে চব্বিশ দিনের জন্যে খরচ পড়বে মাত্র একশ পঞ্চাশ রুবল অর্থাৎ বারশ' টাকা।

তালিন শহরে দুই মহিলা ডাক্তারের সঙ্গে আলাপ হয়েছিল। শুধু এস্তোনিয়ার নয় সমগ্র সোভিয়েত ইউনিয়নে ডাক্তারদের মধ্যে মহিলাদের প্রাধান্যই বেশী। ডাক্তার বলছেন, তিনি ভ্রাম্যমাণ ডাক্তার দলে কাজ করেন। টেলিফোন পেলেই তাঁরা যেকোনো সময়ে চলে যান রুগী দেখতে। দিনে চল্লিশটা রুগী দেখতে হয়। শীতকালে রুগীর সংখ্যা বাড়ে। ডাক্তারদের সঙ্গে থাকে হয় নার্স নয়তো ডাক্তারি জানা নার্স। এরা ডাক্তারের অবর্তমানে অনেক সময় চিকিৎসা চালিয়ে যান। কিন্তু ওষুধও তাঁরা সঙ্গে নিয়ে ঘোরেন। তবে অন্য ওষুধ বাজার থেকে কিনতে হয়। ওষুধের দাম অতি সামান্য। ধরুন দশটা এণ্টেরোভায়োফর্ম ট্যাবলেটের দাম ত্রিশ পয়সা। এই ব্যবস্থা শুধু এস্তোনিয়ায় নয় সমগ্র সোভিয়েত ইউনিয়ন জুড়ে। ডাক্তার দেখালে ফি দিতে হয় না। প্রত্যেক শহরে রয়েছে অনেকগুলো পলি ক্লিনিক। তার ওপর তো আছে হাসপাতাল। নামকরা চিকিৎসক ও সার্জেনদের হাঁকডাক যেমন তেমনি রোজগার। এদের অনেকে প্রচুর রোজগার করেন। তবে সব ডাক্তার নন। যাঁরা কোনো নতুন ধরনের চিকিৎসার পথ দেখাতে পারেন শুধু তাঁরাই।

তালিন থেকে প্যারনু যাওয়ার পথে পড়ল পাইদা নামে একটি ছোট্ট কিন্তু প্রাচীন শহর। সাতশ বছরের পুরোনো এই শহর। লোকসংখ্যা পঞ্চাশ হাজার। শহরতলীতে কাঠের দোতলা বাড়ী। আরও দক্ষিণে তুরি ও সিন্ধ নামে শহর। ছবির মতন দেখতে এই সব ছোট্ট শহরগুলো। পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ও ছিমছাম।

গ্রামের পথে খামার বাড়ীগুলো কাঠের। চারধারে সবুজের মেলা। বনজঙ্গলে ঘেরা। বার্চ ও পাইন গাছের ছাড়াছড়ি। ক্ষেতে রয়েছে গম, আলু, বীট। অগাষ্ট মাসে গম কেটে চাষীরা ঘরে তুলবে।

এদের অবস্থা ফিরেছে। আর দশ বছর এমনিভাবে এরা শান্তিতে বাস করতে পারলে এদের ঐশ্বর্য ছাপিয়ে উঠবে। এ-শুধু এস্তোনিয়ায় নয় সমগ্র সোভিয়েত ইউনিয়ন জুড়ে দেখছি একই অবস্থা। দশ বছর আগে যা দেখেছি তার তুলনায় জনসাধারণের অবস্থা অনেকগুণ ভাল। ক্রয় ক্ষমতা বেড়েছে।

বাজারেও পণ্যদ্রব্য বিলাস দ্রব্যের ছড়াছড়ি। ইতালিয়ান গাড়ীর মডেলে নতুন নতুন গাড়ীর ছড়াছড়ি। যাঁরা ভাবতেন যে, সমাজতান্ত্রিক দেশ মানে শুধু নিচু মানের জীবনযাত্রা তাদের মনোস্কামনা পূর্ণ হল না। সমাজতান্ত্রিক পথেও প্রাচুর্য আনা যায় তার প্রমাণ দিয়েছে সোভিয়েত ইউনিয়ন। তবে তা সম্ভব নয়। সময়সাপেক্ষ। অপেক্ষা করলেই তার সুফল পাওয়া যায়।

## এস্তোনিয়ার লোক নৃত্য

বালটিক সমুদ্র তীরে অবস্থিত এই রাষ্ট্রটি ছোট হলে হবে কি তার সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য অনেক বড় রাষ্ট্রকে ছাড়িয়ে যায়।

এস্তোনিয়া সোভিয়েত ইউনিয়নের অঙ্গ হলেও রাশিয়ার জন-জীবনের সঙ্গে এর কোনো মিল নেই। স্ক্যাণ্ডিনেভিয়ান দেশ গোষ্ঠীর সঙ্গে জড়িয়ে আছে এস্তোনিয়া, ভাষায়, দেহের গড়নে ও সাংস্কৃতিতে। তাদের সাজ-পোষাক ফিনল্যাণ্ডের মতন, ভাষাতো বটেই।

এস্তোনিয়ার রাজধানী তালিনের উপকণ্ঠে সমুদ্রের তীরে 'রোক্কা আল মার্' নামে একটি গ্রামে না গেলে আমার এস্তোনিয়া দর্শন সম্পূর্ণ হত না। রোক্কা আল মার্ ইতালিয়ান শব্দ। সহজ অর্থ হল সমুদ্র তীরে এক খণ্ড পাথর। তালিন শহরে ও তার আশে পাশে ইতালিয়ান স্থাপত্যের যথেষ্ট প্রভাব রয়েছে। দু'তিনশ বছর আগে কিছু ইাতলিয়ান স্থপতি এখানে নগর পরিকল্পনা ও স্থপতির কাজে আত্মনিয়োগ করেছিলেন। তালিনের বহু প্রাসাদ-অট্টালিকায় ইতালিয়ান স্থাপত্যের নিদর্শন এখনও বিরাজ করছে।

রোক্কা আলমার্ গ্রামটি কিন্তু আসলে গ্রাম নয়। বিস্তীর্ণ বন ভূমিকে গ্রাম বানান হয়েছে। এ গ্রামে কেউ বাস করে না। অষ্টাদশ ও ঊনবিংশ শতকে এস্তোনিয়া গ্রামে বাড়ীঘর কেমন ছিল, তাদের লোকজন কেমন করে বাস করত তারই মিউজিয়ম বলা যেতে পারে এই গ্রামটিকে। গোটা পঁচিশেক কাঠের বাড়ী, হলঘর, পাতকুয়ো, উইণ্ড মিল রয়েছে এখানে। এই বাড়ীগুলো সংগ্রহ করা হয়েছে এস্তোনিয়ায় বিভিন্ন জেলার গ্রাম থেকে। সেখানকার গ্রামে বাড়ীগুলো যেমন ছিল ঠিক তেমনি ভাবে এখানেও সাজান হয়েছে। কোথায়

ভাঙচুর হয়নি। গ্রাম থেকে তুলে এনে নিখুঁত ভাবে আবার সাজিয়ে রাখা হয়েছে। সাজিয়ে রাখা হয়েছে ঘরের আসবাব পত্র। প্রত্যেক কাঠের বাড়ীর সামনে, বাড়ীর ইতিহাস ইত্যাদি লেখা আছে।

রোক্কা আল মার্ দেখতে গিয়ে ভেবেছিলাম মিউজিয়ম দেখে আর কি হবে। আর্ট-গ্যালারি ও মিউজিয়ম দেখে পা ব্যথা হয়ে গেছে। সকালবেলা রওনা হবার আগে মনে মনে বিরক্ত হয়েছিলাম মিঃ ইগারের ওপর। দু'দিন আগে আমাদের দোভাষী শ্রীমতি এভী আমাদের অনুরোধ জানিয়েছিলেন, তালিন ছাড়ার আগে যেন রোক্কা আল মার্ দেখে যাই। তখনও ভেবেছিলাম, ও দেখে আর কি হবে।

যাক শনিবার সকালে গিয়ে দেখি রোক্কা আল মারে প্রচুর পরিমাণে বাস দাঁড়িয়ে আছে। টিকিট কেটে গ্রামে ঢুকছে। সামনে বেশ ভীড়। গোটা চারেক আটচালা বাড়ি। বড় বড় কাঠের ঘর তাতে। সামনে পাতকুয়ো। উঠোনটা বেশ বড় তার চারধারে দর্শকের দল। শুনলাম একটু পরেই লোক নৃত্য শুরু হবে। গ্রীষ্মকালে প্রত্যেক সপ্তাহে শনি ও রবিবার সকালে এখানে এস্তোনিয়ায় লোকনৃত্য দেখান হয়। আমরাও দাঁড়িয়ে গেলাম। বিরাট আটচালা হলের সামনে একদল লোক বাদ্য যন্ত্র। কাঠের ও তারের যন্ত্রই বেশী। কয়েকটি কাঠের বাদ্য যন্ত্র অদ্ভুত আকারের। একালের কোনো সঙ্গীতে এগুলো দেখা যাবে না।

এস্তোনিয়ার লোকনৃত্য শুরু হল। একটা নাচ দেখে আমি অবাক। ভাবছি এস্তোনিয়ায় আছি না গুজরাতে? গুজরাতের গরবা নাচের মতন নাচের তাল, লাঠি ইত্যাদি। পোষাকগুলোও সেকেলে গ্রামীন। সবশুদ্ধ ত্রিশজন নাচিয়ে। তাদের অর্ধেক মেয়ে। বাদ্য যন্ত্র বাজিয়ে সংখ্যা পনর জন। তাদের পোষাক ঝলমলে রঙিন। গরবা নাচের কথা জিজ্ঞাসা করেছিলাম জুলিয়া নামে এক নর্তকীকে। সে বললে এ নাচের বয়স ত্রয়োদশ শতকের। একদল ছেলে ও মেয়ে ছোট ছোট লাঠি হাতে নিয়ে নাচে। লাঠির ঠোকা ঠুকিতে খটাখট আওয়াজ তোলে নাচের তালে। তারপর লাঠিগুলো মাটিতে নামিয়ে রেখে তার ওপর দিয়ে তালে তালে পা ফেলে নাচতে হয়।

এমনি আরেকটি লাঠির নাচ দেখে আমার মনে হল ভারতের উত্তর পূর্বাঞ্চলের পার্বত্য নাচের কথা। এখন যেটা মিজোরাম বলে পরিচিত সেই রাজ্যের লোকনৃত্য অনেকটা এদের মতন। তফাৎ শুধু বাঁশের লাঠি ব্যবহার

করে। এস্তোনিয়ার লোক সঙ্গীতের ব্যঞ্জনা আধুনিকের সঙ্গে কোনই মিল রাখেনি। কিছুটা তার সাদৃশ্য দেখা যাবে কাশ্মীরের লোক সঙ্গীতের মধ্যে।

একটা মজার নাচ দেখলাম, নাম তার অশ্ব নৃত্য। একদল মেয়ে হাতে হাত ধরে গোল হয়ে নাচতে থাকে তার পাশ দিয়ে যাবে দু'তিনটে ছেলে। ছেলেদের গলায় ঝোলে ঘোড়ার গলার চামড়ার মালা আর ঘণ্টা। ছেলেগুলো কিছু ঘাস নিয়ে এগিয়ে যায় মেয়েদের কাছে। মেয়েরা তাদের তাড়া করে। তারপর যে ছেলেটাকে তারা ধরে ফেলে, তাকে ধরে নাস্তানাবুদ করে ছাড়ে।

আরেকটা নাচ রুমাল নিয়ে নাচা। এটি শিল্পের দৃষ্টিতে সার্থক। আরেকটি নাচে একদল মেয়ের কাছে এসে কয়েকটি ছেলে প্রেম নিবেদন করলে যখন কোনো মেয়ে তাকে স্বীকৃতি দেয় তখন সেই ছেলেটাকে ঘিরে ধরে মেয়েরা। সেই ছেলেটা তখন পালাবার পথ খোঁজে। গায়ে জোর থাকলে ছেলেটা সেই মহিলা ব্যূহ ভেদ করে পালায় নইলে বন্দী থাকে। তবে দেখা গেছে ছেলেরা গায়ের জোরে অনেক বেশী। একাই গোটা সাতেক মেয়েকে বাহুবলে কাবু করে পালাতে সমর্থ হয়।

পেরেক নাচ সবার চেয়ে মজার। একদল মেয়ে, শেষের মেয়ের কাছে থাকে একটি পেরেক। ছেলের দল নাচের তালে তালে এগিয়ে গিয়ে তার কাছে পেরেক চাইলে সেও নাচের তালে দলের মধ্যে মিশে যায়। তাকে খুঁজে বার করতে ছেলেদের দল হয় গলদঘর্ম। শেষে অবশ্য ছেলেদের জয় হয়। তারা মরিয়া হয়ে সেই পেরেক প্রাপ্ত মেয়েটার হাত থেকে পেরেক খুঁজে বার করে। ভীষণ হাস্য রোলের মধ্যে সাঙ্গ হয় এই নাচ।

পোলকা নাচের মতন দাদুর পোলহা নাচ দেখার মতন। যৌথ ভাবে ছেলে-মেয়েরা নাচে, নাচতে-নাচতে ছেলে তার মেয়ে সঙ্গীকে উর্দ্ধে তুলে ধরে।

এস্তোনিয়ার লোক নৃত্যে যতখানি আছে শিল্পী মনের ছাপ তার চেয়েও বেশী দেখা যাবে শারীরিক কসরৎ। এস্তোনিয়ানদের স্বাস্থ্য ভাল। সবাই প্রায় লম্বা। দেহের গড়ন সুঠাম। মাথায় এক ঝাঁকড়া সোনালী চুল। সবমিলিয়ে শিল্পীসুলভ চেহারা।

রোক্কা আল মারের মিউজিয়ম গ্রামে যারা নাচেন তাদের সঙ্গে আলাপ পরিচয় হয়ে অনেক কিছুই জানতে পেলাম। তারা কিন্তু সবাই পেশাদার নর্তক বা নর্তকী নন। জনা পাঁচেক পেশাদার নর্তক-নর্তকী। বাকিরা

শৌখিন নাচিয়ে। অন্ত পেশা তাদের মধ্যে বেশীর ভাগই ছাত্র-ছাত্রী। কয়েকজন শিক্ষক-শিক্ষিকা। অবশ্য স্কুলে এঁরা গান অথবা নাচ শেখায়।

লোক নৃত্য পর্ব শেষ হলে ওদের একটি ছোট্ট দল আমার সঙ্গে আলাপ জুড়ে দিল। ওদের অনেকেই ভারতীয় দেখেনি পরিচয় তো দূরের কথা। ওরা ছিল তিনজন মেয়ে আর দুজন ছেলে। টিনা নামে মেয়েটি ইংরেজী জানে। বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রী। সে বললে, আমি সখ করে এখানে নাচতে আসি। লোক নৃত্য আমার ভাললাগে।

আমি জানালাম—ক্লাসের পড়া-শোনা চালিয়ে তুমি নাচের সময় পাও ?

টিনা বললে—লোক নৃত্য ভালবাসি বলেই এই দলে আমি নাচছি গত এক বছর ধরে। আর তাছাড়া সারা বছর তো আর আমায় রোজ নাচতে হয় না। ভাববেন না যে, এখানে যে কেউ এলেই নাচতে বা গাইতে পারে। আমাদের প্রায় সবাই কোনো না কোনো গানের বা নাচের স্কুলে শিখেছে। দেখলেন না সবাই প্রায় লোক সঙ্গীত গাইছিল ? শুধু নাচ জানলেই হয় না, গান গাইতেও জানা চাই। লোক সঙ্গীতের ভাবার্থগুলো সবার মনে দাগ কাটে। সবাই বুঝতে পারে বলেই এত জনপ্রিয়।

ওদের ওই ছোট দলের একটি ছেলে আমায় রোক্কা আলমার এর গ্রাম দেখাতে নিয়ে চলল।

ছেলেটা বলল—এস্তোনিয়ার বড় বড় শহরের অনেক অট্টালিকা আর প্রাসাদ দেখেছেন। দেশের সবাই তো অট্টালিকায় আর প্রাসাদে বাস করত না। সেকালে লোক সংখ্যার আশীভাগ বাস করত গ্রামে। ওই দেখছেন না কাঠের বাড়ী, আটচালার ঘর। ওখানে শীতকালে যখন কনকনে ঠাণ্ডা হাওয়া বইত যখন এসব বাড়ী কখনই আরামদায়ক হত না। এখন অবশ্য গ্রামে অধিকাংশই হয় বড় বড় কাঠের বাড়ি নয় তো ইঁটের দালান কোঠা। আমার দেশের জনগণ কি ভাবে গ্রামে বাস করত তার পরিচয় পাবেন এইসব বাড়ী গুলো দেখলে। এস্তোনিয়া সরকার ১৯৫৮ সালে এই মিউজিয়ম গ্রামের কাজ সুরু করে। ১৯৬৪ সালে গ্রাম মিউজিয়ম খোলা হয়। আর ১৯৬৭ সালে শুরু হয় লোক সঙ্গীত ও নৃত্যের আয়োজন। এস্তোনিয়ার গ্রাম্য জীবন, গ্রামীন সংস্কৃতি জানতে হলে রোক্কা আলমার ত সবাইকে আসতে হবে। এ শুধু বিদেশী পর্যটকদের জাত নয়। এস্তোনিয়ার জনসাধারণ আর ছাত্র-ছাত্রীরা আসে দলেদলে তাদের দেশের সাংস্কৃতিক ইতিহাস দেখতে। বইপড়ে

যা জানা যায় তার চেয়ে অনেক সহজ ভাবে জানতে পারবে দর্শকরা এই গ্রাম মিউজিয়াম দেখে।

আমি ভাবছিলাম আমাদের দেশের কথা। বাংলাদেশের গ্রামগুলোর ছবি আমার চোখে ভেসে উঠল। সে দৃশ্য করুণ। পশ্চিম বাংলায় আর কটাই বা শহর। সবই তো গ্রাম। একশ বছর আগে, দুশো বছর আগে বাংলাদেশের গ্রামের বাড়ীগুলো কেমন ছিল, এখনই বা কেমন তার কি একটা গ্রাম মিউজিয়ম হতে পারে না কলকাতার উপকণ্ঠে? বাংলাদেশের লোক সঙ্গীত ও নৃত্যনিয়ে বহু গবেষণা হয়েছে ও হচ্ছে। সহানুভূতির কোনো অভাব নেই। কিন্তু লোকনৃত্য হয়ত এককালে লুপ্ত পাবে। প্রত্যেক জেলার লোক সঙ্গীত ও লোকনৃত্যকে জনসাধারণের কাছে পৌছে দেবার মতন, রোক্কা আলমার এর মতন একটা গ্রাম মিউজিয়ম করে সেখানে যদি কোনো সরকারি বা বে-সরকারি প্রতিষ্ঠান সংরক্ষণের ব্যবস্থা করতে পারেন তাহলে নিশ্চই জনসাধারণের কাছ থেকে সহযোগিতা পাবেন তাঁরা। পাবেন সহানুভূতি ও প্রশংসা। সরকারের সাংস্কৃতিক দপ্তর এদিকে নজর দিতে পারেন।

টিনা—লিণ্ডার ছোট্ট দল আমায় আমন্ত্রণ জানাল সেদিন বিকেলে। ভারতবর্ষ সম্বন্ধে তাদের জানার আগ্রহ প্রবল। ওদের পাঁচ জনের সবাই তরুণ। তিন জনই ছাত্র। ওরাই বললে—আসুন না আজ বিকেলে আড্ডা জমানো যাবে। আমি বললাম—আলবৎ।

বিকেলে ওরা আমায় নিয়ে গেল তালিনের এক পুরোনো কাফেতে। হান্স নামে ছেলেটা সবে এঞ্জিনিয়ারিং পাশ করেছে। একটা কারখানায় কাজ করে। তার প্রশ্ন—কলকাতা নাকি ভীষণ বড় শহর। লোক গিজ্ গিজ্ করে রাস্তায়। উত্তরে আমি জানালাম—কথাটা মিথ্যে নয়। তোমাদের তালিনের লোক সংখ্যা তিন লাখ। আমি কলকাতার যে অঞ্চলে বাসকরি সেই অঞ্চলের লোক সংখ্যা পাঁচ লাখের ওপর। শুনে শ্রীমতি টিনা তো অবাক। আমি ওকে বললাম—চোখ বড় করে দেখছ কি? কলকাতার লোক সংখ্যা সত্তর লাখ। তোমাদের এস্তোনিয়ার মাত্র তেরলাখ।

শ্রীমতিটিনা বললে—চলুন যাইআমরা টুম্পিয়া টিলার নিচে ক্যারোলিনা বারে। শীতকালে ওই বারে বেশ জমে। অধিকাংশ সময়েই তুষার পাতে শহরে সাদা চাদর বেছানো মনে হবে। গাছপালা সব ন্যাড়া। সবুজ কোথাও নেই। পার্কে বসার জো নেই। কিন্তু এই বারটা পার্কেই। পার্কে এসে সোজা ক্যারো-

লিনা বারে ঢুকে পড়লেই হল। বাইরে যত ঠাণ্ডা থাকুক, ভেতরটা বেশ গরম থাকে। হয় গরম মদ না হয় গরম কফি নিয়ে পান করলে শরীরটা চাঙ্গা হয়ে ওঠে। যত ঠাণ্ডাই লাগুকনা কেন ক্যারেলিনার বিখ্যাত গরম মদ খেলে শরীর গরম হবেই।

গ্রীষ্মের সন্ধ্যা। রোদ স্তিমিত হয়ে এসেছে। রাত এগারটায় সন্ধে হয়। পার্কগুলোতে সবুজের মেলা বসেছে। টুম্পিয়া টিলাটা ঢেউ খেলান। শহরের মাঝখানে খানিকটা পর্বত স্তূপের মতন। উঠলেই চড়াই—উৎরাই আর বাগান। তারই পাশে রয়েছে ঐতিহাসিক টুম্পিয়া দুর্গের ধ্বংসাবশেষ। এই টিলার এক কোণায় ক্যারেলিনা বার। ঢুকে দেখি পাহাড়ে একটি সুড়ঙ্গপথ। এই সুড়ঙ্গটাকেই বার বানানো হয়েছে। বার-এ বসবার জায়গা নেই। মোটা মোটাগাছের গুঁড়িকে টেবিল বানানো হয়েছে। এই মোটা টেবিলে গেলাস রেখে, প্লেট রেখে দাঁড়িয়ে খেতে হয়। আমরাও গরম মদের গ্লাস নিয়ে গল্প জুড়ে দিলাম।

প্রথমে জিজ্ঞাসা করলাম শ্রীমতি টিনাকে, তোমার কাহিনী শোনা যাক। টিনা হাল্কা সুরে জানাল—আমার কোনো ইতিহাস নেই। পরীক্ষায় পাস করে চাকরি করব। তারপর বিয়ে করে সংসার করব। ব্যাস আর কিছু নয়। বরং লিণ্ডার জীবন অনেক বৈচিত্র্যময়।

সবাই নাছোড়বান্দা দেখে লিণ্ডা বলতে লাগল তার জীবনের ইতিকথা। সব শুনলে কোনো ঔপন্যাসিক একটা ছোটখাট উপন্যাস লিখতে পারতেন। আমার আবার ওসব আসেনা। সাংবাদিকের কলমে সব ঘটনা ও ইতিহাস সংক্ষেপে সারতে হয়।

লিণ্ডা যা বললে তার সংক্ষিপ্তসার এই—লিণ্ডার বাড়ীতে তিন জন মহিলার সংসার। তার মা, সে নিজে ও তার পাঁচ বছরের মেয়ে। সে নিজে একটা স্কুলের শিক্ষিকা। সেখানে সে গান শেখায়। লোক সঙ্গীতও তার প্রিয় তাই সে রোক্কা আলমার-এ গান গায় ও নাচে। সামান্য পারিশ্রমিক পায়। মনের মতন গাইতে ও নাচতে পারে বলে সে সুখী। তার জীবনে অনেক দুঃখ এসেছে। সব দুঃখকে ম্লান করে তার জীবনে আনন্দ এনে দিয়েছে এই লোক সঙ্গীতের দল। তারও বিয়ে হয়েছিল। সংসারও সে করেছিল। কিন্তু তার স্বামীটি ছিল পাঁড় মাতাল। লিণ্ডা আরও পড়াশোনা করতে চাইলে তার স্বামী তাকে বাধা দেয়। সেই থেকে মনোমালিন্য এবং

পরে বিচ্ছেদ। তার স্বামী এই তালিন শহরেই বাস করে। বছর কয়েক আগে ফিনল্যাণ্ডের এক যুবকের সঙ্গে তার আলাপ হয়। পরিচয় থেকে প্রণয়ে জড়িয়ে পড়ে সে। সেই প্রেমের ফুল হিসেবে সে উপহার পেয়েছে তার মেয়েকে। মেয়েকে নিয়ে সে সুখী। ফিনিশ যুবকটি ফিরে গেছে তার দেশে ফিনল্যাণ্ডে। এস্তোনিয়ার ভাষার সঙ্গে ফিনল্যাণ্ডের ভাষার যথেষ্ট মিল রয়েছে। প্রেমপর্ব সেখানেই সমাপ্ত হয়েছে।

লিণ্ডা বললে—আমার মেয়ে এখনও শিশু। সব দেশের শিশুই এক। ওর কি দোষ। আমি তাকে সব কিছু দিয়ে মানুষ করে তুলছি। আমি পরিশ্রম করছি আমার একমাত্র সন্তানের জন্যে। প্রেম, ভালবাসা, সংসার আমার যথেষ্ট হয়েছে। আর নয়। এই তো আমার জীবনের কাহিনী।

ওদের সঙ্গে গল্পে মেতে ছিলাম অনেকক্ষণ। ঘড়ির কাঁটা আমাদের জন্যে বসে থাকে নি। রাত তখন অনেক হয়েছে। আমাকে তারা হোটেলে পৌঁছে দিল। তারা ফিরে গেল যে যার ঘরে।

## একালের সোভিয়েত সমাজ ও বিবাহ

রুশ বিপ্লবের পঞ্চাশ বার্ষিকী পালিত হয়েছে ১৯৬৭ সালে। রুশ বিপ্লব শুধু রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক পরিবর্তন আনেনি সোভিয়েত দেশে। সোভিয়েত সমাজে এনেছে উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন। চিরাচরিত সমাজ ব্যবস্থায় অভ্যস্ত ভারতীয়দের কাছে শুধু নয়, পশ্চিম ইউরোপের উদারনৈতিক সমাজের সঙ্গে একালের সোভিয়েত সমাজের তুলনা করলে বিরাট পার্থক্য চোখে পড়বে। আমি ভারতীয় হিসেবে আমাদের রক্ষণশীল ও গতানুগতিক সমাজকে যেমন জানি তেমনি পশ্চিম ইউরোপের উদারনৈতিক সমাজে বাস করে সোভিয়েত দেশে নতুন সমাজ দেখে এবং তুলনামূলক বিচারে ফারাক ও প্রগতি দেখে বিস্মিত হয়েছি। সোভিয়েত দেশ কম্যুনিজমের শ্রেণীহীন রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক কাঠামো আরোপ করতে কতখানি কৃতকার্য হয়েছে সে বিষয়ে সবটা না বলতে পারলেও একথা স্বীকার করবো যে সমাজনীতি ও সমাজজীবনে তারা শুধু উদারনৈতিকই নয় বরং "শ্রেণীহীন সমাজের পথে

অনেকখানি এগিয়েছে। প্রথমত জাত-ফাত, প্রাদেশিকতার বালাই নেই সামাজিক মেলামেশায়। দ্বিতীয়ত ধর্মীয় বাধানিষেধের বেড়াজাল নেই সমাজে ও পরিবারে।

সোভিয়েত সমাজে শ্রমমর্যাদাকে অগ্রাধিকার দেওয়া হয়ে থাকে। ফলে চাকরিক্ষেত্রে মেয়ে-পুরুষের শ্রেণীগত কোনো পার্থক্য নেই। যে সব কাজ এখনও অনেক দেশে পুরুষের একচেটে সে সব কাজে সোভিয়েত দেশে অসংখ্য মেয়ে পুরুষের মতনই কাজের যোগ্যতা দেখিয়ে যাচ্ছে। সুতরাং আয়ের দিক থেকে মেয়েরা পুরুষদের চেয়ে কোনো অংশে কম রোজগার করে না।

আমাদের দেশের সঙ্গে কোনো তুলনাই হয় না। পশ্চিম ইউরোপের উন্নত দেশেও কিন্তু মেয়ে এঞ্জিনিয়ার ডাক্তার-সার্জন খুব বেশী নেই। সোভিয়েত ইউনিয়নে এঞ্জিনিয়ারদের মধ্যে প্রায় এক-তৃতীয়াংশ হল মেয়ে। আর ডাক্তার, সার্জন, দাঁতের ডাক্তারদের মধ্যে অর্ধেকের বেশী মেয়ে। ইস্কুল, হাসপাতালে তো প্রমীলার রাজত্ব। আমি তো নিজের চক্ষে দেখেছি গৃহনির্মাণ ও রেললাইনে অসংখ্য কর্মরত মেয়ে শ্রমিক। এগুলো যেমন ভারী, তেমনি কষ্টকর কাজ। এইসব শক্ত কাজে মেয়ে শ্রমিকদের দেখা যাবে না পশ্চিম ইউরোপে।

সর্বস্তরের কাজে সোভিয়েত ইউনিয়নে স্ত্রী-পুরুষের ভেদাভেদ নেই বলে সামাজিক স্তরে এসেছে সত্যিকারের সমতা। ফলে প্রতিটি সামাজিক স্তরে, এদেশে ঐক্যভাব এসেছে। সামাজিক মেল-মেশা, বিবাহ ও পরিবার গঠনে কোনো সামাজিক বা অর্থনৈতিক বাধা নেই। যা আছে আমাদের দেশে। রুশ বিপ্লবের আগে জারের আমলে কোনো কৃষককন্যার সঙ্গে কী কোনো সামন্তপুত্রের বিবাহ সম্ভবপর ছিল? ছিল কী সম্ভবপর কোনো জর্জিয়ান বা তাজিক এঞ্জিনিয়ারের সঙ্গে রুশ বা ইউক্রেনিয়ান শিক্ষিকার বিবাহ? এশীয় প্রদেশের সঙ্গে ইউরোপীয় প্রদেশের লোকজনের পার্থক্য অনেক। আজকের যে কোনো সোভিয়েত শ্রমিক এঞ্জিনিয়ার ডাক্তার সাংবাদিক বা শিক্ষক শিক্ষিকা এক প্রদেশ থেকে আরেক প্রদেশে কাজের খাতিরে যেতে বাধ্য হচ্ছে। সেখানে গিয়ে অনেক সময় সে দেশে বিবাহ করে পরিবার গঠন করছে। তাদের কাছে সামাজিক মেলা-মেশা আর কোনো সমস্যাই নয়। যা ছিল পঞ্চাশ বছর আগে অকল্পনীয়। সমাজতন্ত্রবাদের মূলমন্ত্রের অনেকখানি সফল হয়েছে সোভিয়েত ইউনিয়নে। কৃত্রিম অ-সম সামাজিক বাধানিষেধ ও

সমস্যা এখন লোপ পাচ্ছে। যা আমাদের দেশে অতি প্রকট।

আমি নিজে দেখেছি এবং অনেকের সঙ্গে আলাপও হয়েছে সোভিয়েত দেশে। যেমন ধরুন, কোনো উজবেকীস্তানের ছাত্র মস্কোতে পড়তে এসেছিল। সে জাতে এশীয় ও মুসলমান। বিয়ে করেছে লিথুনিয়ার কোনো খ্রীস্টান মেয়েকে। এবং চাকরি করতে গেছে সাইবেরিয়ার কোনো নতুন শহরে। মস্কোতে আমার আলাপ হয় তাতিয়ানা ও স্বয়েৎলানা নামে দুই রুশ মেয়ের সঙ্গে। তাতিয়ানা বিবাহিতা। সে স্বামীর ঘর করে মস্কোয়। এরা দুই বোন জানায় যে তাদের বাবা-মা এখনও বাস করে দক্ষিণ রাশিয়ার এক ছোট শহরে। তারা সবশুদ্ধ ছ' বোন দুই ভাই। এক ভাই বিয়ে করে চাকরি করে লেনিনগ্রাদে। এক বোন শিক্ষিকার কাজ করে তাশখন্তে। এক বোন ডাক্তারি করে সাইবেরিয়ার কোনো এক গণ্ডগ্রামে। তাতিয়ানা ও স্বয়েৎলানা দু' বোনই এঞ্জিনিয়ার। স্বয়েৎলানা বিবাহ ভঙ্গ করে একাই বাস করে মস্কোয় যে বোনটি তাসখন্তে শিক্ষিকার কাজ করে সে নাকি ওখানকার এক শিক্ষককে বিয়ে করবে বলে জানিয়েছে।

সোভিয়েত দেশে সাম্যবাদ চালু হয়েছে বলে মেয়েরা নাকি সৌন্দর্য চর্চা ছেড়ে দিয়েছে। এমনি অনেক আজগুবি গল্প শুনেছিলাম। অনেক সোভিয়েত মেয়ের মুখে শুনেছি যে, অন্য দেশের মেয়েদের মতন তারাও গহনা পরতে ভালবাসে নানা সুগন্ধি আতর মাখতে এবং মুখশ্রী বাড়াতে সবরকমের প্রসাধন দ্রব্য ব্যবহার করতে ভালবাসে এবং আজকাল করেও থাকে। পঞ্চাশ বছরের এক মহিলা এঞ্জিনিয়ার বলেছিলেন যে, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের আগে স্তালিনের সময়ে এত সৌন্দর্য চর্চা হত না। আজকাল সুগন্ধ দ্রব্যের চলন বেড়েছে। এমন কি তিনিও বয়স কমাবার জন্যে নানান প্রসাধন দ্রব্য ব্যবহার করেন। তবে একজন গায়িকা যিনি চিন্তাশীলদের দলে পড়েন তিনি আমায় বলেছিলেন যে অন্তত তিনি নিজে গহনা পছন্দ করেন না এবং তাঁর মতন আরও অনেক সোভিয়েত মহিলা ওসব পছন্দ করেন না। তাঁরা গহনা ছাড়াই দেহের সৌন্দর্য বাড়িয়ে তুলতে চান।

সোভিয়েত রাষ্ট্রের পরিচালকদের মধ্যে পুরুষের সংখ্যাই বেশী। তারাই রাজত্ব চালাচ্ছে। সোভিয়েত মেয়েরা সমাজে এনেছে প্রগতি। পশ্চিম দেশের মেয়েদের মতন তারাও চায় পুরুষরা তাদের কাছে প্রেম নিবেদন করুক, প্রেম করে বিয়ে করুক এবং সংসার পেতে সমস্ত দুশ্চিন্তা দূর করুক। অন্যান্য

দেশের মেয়েদের মতন তারাও চায় না খুব বেশী সন্তান। তার জন্যে প্রয়োজন জন্মনিরোধক ঔষধ ও দ্রব্যাদি। সোভিয়েত আইন গর্ভনাশের বিরুদ্ধে কিন্তু আজকাল প্রয়োজন হলে সরকার তার জন্যে যথাসাধ্য সাহায্য দিয়ে থাকেন।

প্রগতিশীল সোভিয়েত সমাজের বুনিয়াদ হল মেয়েরা। পুরুষের তুলনায় মেয়েদের সংখ্যা একটু বেশী। প্রতি চারজন পুরুষে পাঁচজন মেয়ে। ডাক্তারদের মধ্যে শতকরা ৭৫% জনই মহিলা, শিক্ষকদের মধ্যে শতকরা ৭০% জন মহিলা, আইনবিদদের মধ্যে শতকরা ৪০% জন মেয়ে আর এঞ্জিনিয়ারদের মধ্যে শতকরা ২০% জন মেয়ে।

রাজনীতিতে কিন্তু মেয়েদের সংখ্যা খুব বেশী নয়। কম্যুনিস্ট পার্টির মেম্বারদের মধ্যে মাত্র শতকরা ২০% জন মেয়ে আর লোকসভায় মেয়ে সদস্য সংখ্যা শতকরা ২৭% জন।

সোভিয়েত সমাজের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে পরিবারে শাশুড়ি ও দিদিমার গুরুত্ব কমে যাচ্ছে। পুরোনো সমাজে শাশুড়ির কর্তৃত্ব ছিল বেশ। দিদিমা-ঠাকুমারা নাতি নাতনি নিয়ে আমোদে থাকতেন। সে সম্পর্কটা কিন্তু খুব বেশী শিথিল হয়নি। এখনও অনেক পরিবার তাঁদের সন্তানদের ঠাকুমা-দিদিমার কাছে রেখে কিছুদিনের জন্যে নিশ্চিন্ত থাকেন।

রুশ বিপ্লবের কিছুকাল পূর্বে ও তার পরে প্রতিক্রিয়াস্বরূপ রুশ সমাজে হঠাৎ পরিবর্তন যেমন হয়েছিল তেমনি দেখা দেয় কিছুকাল পারিবারিক জীবনে "রাষ্ট্রীয়করণ"। ১৯২৬ সালে তার কিছুটা পরিবর্তন হয়। কিছুদিন আগেও বিবাহিত মহিলারা স্বামীর পদবী নিজের নামের পেছনে ব্যবহার করতেন না। অনেক ক্ষেত্রে ছেলে-মেয়েরা মায়ের পদবী ব্যবহার করত। এখনও তার দৃষ্টান্ত দেখা যায়। ইদানীংকালে পারিবারিক ও সমাজজীবনে বেশ পরিবর্তন দেখা দিয়েছে। আমাদের দেশের মতন কোন অর্থনৈতিক বা সামাজিক দুশ্চিন্তা নেই বলে আজকাল অল্প বয়সে যেমন বিবাহ হয় তেমনি অল্প সময়ের মধ্যে বিবাহ ভাঙেও। বিবাহভঙ্গের সংখ্যা বাড়ছে বলে সোভিয়েত সরকার নতুন আইন প্রণয়ন করে জানিয়েছে যে বিবাহভঙ্গের মামলা করেই বিবাহ ভাঙা চলবে না। অন্তত ছ'মাস সময় অপেক্ষা করতে হবে।

মস্কো বিশ্ববিদ্যালয়ের কিছু তরুণ ছাত্র-ছাত্রীর সঙ্গে আলাপ হয়েছিল। তাদের দু'তিনজন ছিল বিবাহিত। আবার তার মধ্যে একজন ছিল বিবাহ-

ভঙ্গকারী। বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের স্কলারশিপের টাকার অঙ্ক বেশ স্ফীত। তাতে তারা অনায়াসে বিয়ে করে সংসার চালাতে পারে। এবং বিয়ে করার খরচও নেই বললেই চলে। ফলে অল্প বয়সে যেমন বিয়ে হচ্ছে তেমনি ভাঙছেও। সমাজতান্ত্রিক সমাজে বিবাহভঙ্গকারীদের সন্তানদের কোনো আর্থিক বা সামাজিক কষ্ট পেতে হয় না। সবই তো রাষ্ট্রের অধীনে। রাষ্ট্রের তত্ত্বাবধানে শিক্ষা, স্বাস্থ্য সবই দেখার ভার। সুতরাং কেউই দুঃস্থ অবস্থায় জীবন কাটাতে বাধ্য নয়। যেমন অন্য অনেক দেশ রয়েছে।

আমাদের কাছে হয়ত নতুন মনে হবে কিন্তু ইউরোপীয় সমাজে নতুন নয়। সোভিয়েত সমাজে ব্যাপকভাবে দেখা যাবে যে বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র বা গবেষক ছাত্রাবস্থায় কোনো শ্রমিক বা টাইপিস্ট মেয়েকে বিয়ে করে সংসার চালাচ্ছে। যতদিন পর্যন্ত না ছাত্রটি ভালভাবে পাশ করে কোনো উচ্চপদে প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে ততদিন তার স্ত্রী চাকরি করে সংসারে সাহায্য করছে। এমনি দৃশ্য আমি বহু দেখেছি সোভিয়েত সমাজে।

ইদানীংকালে সোভিয়েত সমাজের গতি কোন দিকে যাচ্ছে সে সম্পর্কে সামাজিক সমীক্ষা চালিয়েছিলেন লেনিনগ্রাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের কয়েকজন সমাজবিজ্ঞানী। সেই সমীক্ষার ফলাফল থেকে জানা গেছে অনেক অ-জানা কাহিনী। পাঁচশটি বিবাহভঙ্গকারী মহিলার মতামত নেওয়া হয় ওই সমীক্ষায়। সমীক্ষায় বলা হয়, তাদের মধ্যে শতকরা ৬০% জন প্রেম করে বিয়ে করেছিল, ২০.৫% জন তাদের ভবিষ্যৎ স্বামীদের প্রাণের চেয়েও ভালবাসত। ৪০% জনের প্রেম গাঢ় ছিল না, ২০.৫% জনের ছিল চেহারার প্রতি আকর্ষণ। ১.৫% জন কোনো উচ্চবাচ্য করত না, ২% জন একদমই ভালবাসত না এবং ১৫% জন কোনো উত্তরই দেয়নি।

বিবাহভঙ্গটা কেবলমাত্র অল্পবয়সী বিবাহিতদের মধ্যে বেশী সে ধারণা ভুল। ৫৯% জনের ত্রিশের ওপর আর ২০% বিবাহভঙ্গকারী দশ বছরের বেশী বিবাহিত জীবন যাপন করে। ২৫% জন সংসার করে পাঁচ থেকে দশ বছর। ২০% জন এক বছরের কম সংসার করে।

যাদের মধ্যে মতামত নেওয়া হয় তাদের মধ্যে পুরুষেরা জানায় যে তারা তাদের স্ত্রী বেছে নেয় এইসব গুণের প্রাধান্য হিসেবে যেমন ১৫% জনের গুণ ছিল মিশুকে বলে ১২% জনের গুণ ছিল ভদ্রতা ১২% জন ভাল সংসার চালাতে জানত বলে।

মেয়েদের মতামত নিয়ে জানা যায় তারা কোন্ কোন্ গুণ পছন্দ করে তাদের স্বামী হবার যোগ্য পুরুষদের কাছে। ১৬% মেয়ে চায় তাদের স্বামীরা হবে ভদ্র ও মার্জিত রুচিসম্পন্ন। ১৬% জন পছন্দ করে হৃদয়বান-স্পর্শকাতর এবং সংসারে মনোযোগী ১৫% জন চায় মিশুকে। এর ওপর ১৩% জন চায় তাদের স্বামীরা হবে বিশ্বাসী ১২% চায় না কোনো কিছুর বাড়াবাড়ি। ৮% জন পুরুষ চায় তাদের স্ত্রীরা হবে কমনীয় শুদ্ধ মেয়েলিভাবাপন্ন এবং মেয়েরা চায় তাদের স্বামীরা হবে শক্তিশালী। কেবলমাত্র ৬% জন মেয়ে চায় স্বামীরা হবে ভীষণ বুদ্ধিমান।

বিবাহভঙ্গকারীদের প্রশ্ন করা হয় তারা কেন বিবাহ ভঙ্গ করেছে। উত্তরে ৬৬% জন পুরুষ ও ৭৫% মেয়ে জানায় যে তাদের মধ্যে মতের মিল না হওয়ায় বিবাহ ভঙ্গ করতে বাধ্য হয়। তাছাড়া আরও কারণ দেখানো হয়, যেমন কখনই এক মত হত না, রসিকতা বোঝার মতন কাণ্ডজ্ঞান ছিল না, প্রেম ও প্রণয় জ্ঞান ছিল না, সংসারে মন ছিল না, অসৎ, মাতাল ও দৈহিক গোলযোগ। ১৮% জন পুরুষ জানায় যে তাদের স্ত্রীরা হৃদয়বতী ছিল না ১৭% অনুযোগ করে অ-সতীত্বের জন্য এবং ১৪% সংসার চালাতে জানত না।

বিবাহভঙ্গকারীদের পাঁচজনের মধ্যে একজন জানায় যে তাদের সংসারে অশান্তি প্রবেশ করে দুটো কারণে অত্যধিক মদ্যপান ও গৃহের অভাবে সংসার পাততে না পারায়। আরেকটি প্রধান কারণ হল বিয়ের আগে দুই পক্ষের স্বল্প পরিচয় এবং হঠাৎ বিয়ে করা। বিয়ে না করা মায়েদের সংখ্যা কম নয়। সোভিয়েত দেশে অবিবাহিত মায়েদের সংখ্যা বিশ লাখ। তবে এদের সন্তান-দের দেখাশোনার ভার রাষ্ট্রের। তারা মায়ের পদবী ব্যবহার করে থাকে। বিবাহভঙ্গ যাতে কমে তার জন্যে সমাজবিজ্ঞানীরা বলেছেন যে, হঠাৎ প্রেমে পড়া ভাল কিন্তু হঠাৎ বিয়ে করা ভাল নয়। এঙ্গেলসের মত উদ্ধৃতি করে বলা হয়েছে, যখন বিবাহিত জীবন সুখের হয় না তখন শান্তি ফিরে পেতে হলে বিবাহভঙ্গই শ্রেষ্ঠ উপায়। লেনিনগ্রাদের সমাজবিজ্ঞানীরা আরও বলেছেন যে বিবাহভঙ্গ রোধ করতে হলে চিরাচরিত প্রথা গৃহসমস্যা ও বস্তুবিশেষের ওপর দোষারোপ করে লাভ নেই। প্রথম ও শেষ প্রশ্নটি হল মানুষ। মানুষই সংসার পাতে এবং স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক বজায় রাখতে পারে একমাত্র প্রেম। বিবাহভঙ্গের প্রতিষেধক একটি শব্দ সে হল "প্রেম"।

১৯৭২ সালে সোভিয়েত ইউনিয়নের অর্ধশতাব্দী পালনের সময়ে দেখা

যাচ্ছে সমাজতান্ত্রিক সমাজে মধ্যযুগের রাজনীতি লোপ পেতে বসেছে। সোভিয়েত ইউনিয়নে আজকাল যে সব বিবাহ হচ্ছে তার মধ্যে তথাকথিত অ-সম বিবাহের, অর্থাৎ সমাজের বিভিন্ন গোষ্ঠীর মধ্যে বিবাহের হার বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এক সমীক্ষা থেকে জানা গেল এই ধরণের বিবাহ সোভিয়েত সমাজের মোট বিবাহের শতকরা ত্রিশ ভাগ।

ওই সমাজ সমীক্ষায় বলা হয়েছে যে রাশিয়ার কাজান শহরের ৫০০ অফিস কর্মীর কাছে প্রেরিত প্রশ্নপত্র থেকে জানা গেছে, তাদের মধ্যে প্রায় ২০০ জনই কারখানার শ্রমিকদের বিয়ে করেছেন। ওরেনবুর্গে শিল্প সমূহ ও রেলওয়েতে নিযুক্ত এ্যাকাউন্ট্যান্টদের দুই তৃতীয়াংশ, সমীক্ষাভুক্ত চিকিৎসকদের এক তৃতীয়াংশ, কারখানা ও পরিবহন শিল্পে নিযুক্ত ইঞ্জিনিয়ার ও প্রযুক্তি-বিদদের এক চতুর্থাংশ নর-নারীই কায়িক শ্রমে নিযুক্ত শ্রমিক নর-নারীকে বিবাহ করেছেন।

মস্কোর চিত্রটি এই রকম। কালিনিন অঞ্চলে একটি সমীক্ষা চালিয়ে দেখা গেছে সেখানে তিন জনের একজন অ-সম বিবাহ করেছেন।

সমাজতান্ত্রিক সমাজে শিক্ষা-সংস্কৃতির প্রগতির জন্যেই অ-সম বিবাহ সংখ্যা বাড়ছে। মস্কোর কালিনিন অঞ্চলের রেজিস্ট্রী অফিসের তালিকা থেকে দেখা যায় যে, ফিটার ও এঞ্জিনিয়ার, ফিটার ও চিকিৎসক, ডিজাইন এঞ্জিনিয়ার ও মেয়ে—দর্জি, মোটর গাড়ীর চালক ও কিণ্ডারগার্টেন কর্মী, মেকানিক ও অভিনেত্রী, এই ধরনের আরো অনেক রকমের পেশার নর-নারীর মধ্যে বিবাহ হচ্ছে।

গ্রামাঞ্চলে শহরাঞ্চল অপেক্ষা অ-সম বিবাহ হয় অনেক কম। শহরাঞ্চলে যেখানে মোট বিবাহের এক তৃতীয়াংশই অ-সম বিবাহ গ্রামাঞ্চলে তার অনুপাত হল প্রতি দশটিতে একটি। এর কারণ প্রধানতঃ গ্রামের অধিবাসীদের পারিবারিক অখণ্ডতা। আরেকটি কারণ হল, গ্রামীন সমাজ জীবনে এখনও পুরোনো সংস্কারের অবশেষ রয়ে গেছে।

সোভিয়েত দেশে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠায় আজকাল এই ধরণের অ-সম বিবাহ অনেক সহায়ক হচ্ছে। পারিবারিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে সামাজিক শ্রেণী পার্থক্য দূর করছে।

সমাজতান্ত্রিক দেশের সমাজ ও বিবাহিত জীবন সম্পর্কে সব দেশে দেখেছি সমান কৌতুহল। সমাজতান্ত্রিক পরিবেশে সমাজের চিত্র বদলাচ্ছে। কিন্তু

বিবাহের লৌকিক আচারগুলো খুব বেশী ব[illegible]ায়নিক [illegible] হয়েছে — একটি চমৎকার প্রবন্ধ লিখেছেন ইজভেস্তিয়ার এক বিখ্যাত সাংবাদিক এডুয়ার্ড সের কোভের। সে লেখাটার পুরো অংশটি তুলে দিলাম।

"মস্কোর বিবাহ-প্রাসাদ থেকে জানতে পারলাম যে, সেখানকার উৎসব-সজ্জায় সজ্জিত হলগুলিতে প্রতিদিন প্রায় ৫০টি করে সুখী দম্পতি বিবাহিত হন। দাম্পত্যের বন্ধনে আবদ্ধ হতে আসা নরনারীর সংখ্যা জানুয়ারি মাসের গোড়ার দিকে খুব বাড়ে, অনেক তরুণ-তরুণীই নববর্ষ আগমে নতুন করে জীবন শুরু করতে চান।

বিবাহ উৎসবগুলিতে ভাব-গাম্ভীর্য ও উৎসব মুখরতার এক সমধুর সংমিশ্রণ ঘটে। 'দু' পক্ষ গাড়িতে করে প্রাসাদে আসেন। কনে আসেন সাদা পোশাকে, মাথায় ওড়না পরে, আর বর আসেন খানিকটা আনুষ্ঠানিক পোশাকে। তাঁদের সঙ্গে থাকেন সাক্ষী, আত্মীয়স্বজন ও বন্ধুবান্ধব।

বিয়ের বাজনার মধ্যে উৎসব-সজ্জায় সাজান বিবাহ রেজিস্ট্রেশনের টেবিলটির দিকে এগিয়ে যান বর-কনে, সঙ্গে চলেন সাক্ষীর দল। সরকারী অনুষ্ঠান সমাপ্ত হয় বিয়ের আংটি বদলে, দম্পতির চুম্বন তাতে চূড়ান্ত স্বাক্ষর দেয়। তারপর শুরু হয় অভিনন্দন সৌভাগ্য-কামনা, ফুল উপহার, শ্যাম্পেনের বোতল খোলা, সঙ্গে সঙ্গে চলতে থাকে আনন্দের অভিব্যক্তি, ঠাটা-তামাসা আর ছবি তোলা। তারপর বিবাহভোজের জন্য বরযাত্রী ও কন্যাযাত্রীরা রওনা দেন বাড়ি কিংবা কোনও রেস্তোরাঁর দিকে।

রুশ দেশের বিবাহ-প্রক্রিয়ার প্রচলিত প্রথা হল এই। তাছাড়া আরও অনেক রকম বে-সরকারী আচার ও উৎসবও চালু আছে।

বিবাহ-ভোজের আনন্দ ও সোরগোলের মধ্যে একটা কিছু খেতে খেতে মাঝে মাঝে কোনও না কোনও অতিথি উঠে পড়ে বলেন, 'আরে, এটা দেখছি তেতো'! অমনি আর সব অতিথি ধুয়ো ধরেন "তাইতো, তেতোই বটে!" তখন বিব্রত নবদম্পতিকে উঠে দাঁড়িয়ে চুমো খেতে হয়, যাতে অতিথিদের খাদ্যের স্বাদ মধুর হয়, আর বলা বাহুল্য, যাতে তাঁদের ভবিষ্যৎ জীবনও তেতো না হয়ে মধুর হয়।

গ্রামাঞ্চলেও বিবাহ-ভোজের আগে জেলা রেজিস্ট্রেশন অফিস অথবা গ্রাম সোভিয়েত অফিসে বিয়ের রেজিস্ট্রি হয়। তবে আমাদের বহু-জাতিক দেশের বিভিন্ন অঙ্গ প্রজাতন্ত্রে বিবাহ-উৎসবও ভিন্ন ভিন্ন রকমের হয়।

রুশ গ্রামগুলিতে বিবাহ-শোভাযাত্রা হয় ত্রোইকায় চড়ে, গ্রীষ্মকালে অশ্বটানা গাড়িতে, আর শীতকালে স্লেজে। বিবাহ-রেজিস্ট্রির পর নবদম্পতি যখন বাড়িতে ঢোকেন তখন প্রাচীন প্রথা অনুযায়ী বাড়ির দরজায় তাঁদের উপর পাইন ইত্যাদি গাছের কোন, মুদ্রা ও ফুলের পাপড়ি বর্ষণ করা হয়।

এই উপলক্ষে বিবাহের উপহার সম্বন্ধে একটু বিশেষ উল্লেখ দরকার। যৌতুক দেওয়া-নেওয়ার দিন আমাদের দেশে গত হয়েছে।

উভয় পক্ষের আত্মীয়স্বজনেরা এখন নবদম্পতিকে এমন সব জিনিস উপহার দেন যা তাঁদের বিবাহিত জীবন শুরু করার জন্য দরকার হয়, যথা: প্লেট, ডিস, রান্নাঘরের বাসনপত্র, পর্দা, টেবিল-ঢাকা, চাদর, ওয়াড় ইত্যাদি। যে কারখানা যৌথ খামার বা প্রতিষ্ঠানে নবদম্পতি কাজ করেন, সেখান থেকে প্রায়ই তাঁদেরকে এই উপলক্ষ্যে নতুন ফ্ল্যাট বা তাঁদের জন্য বিশেষভাবে নির্মিত নতুন বাড়ির চাবি উপহার দেওয়া হয়। আর নবদম্পতির যদি ভাল বাসস্থান ইতিমধ্যেই থেকে থাকে তো তাঁদেরকে উপহার দেওয়া হয় টেলিভিশন সেট, রেডিও, কাপড় কাচার যন্ত্র, আসবাবপত্র ইত্যাদি।

জাতীয় রীতিনীতিও বিবাহ-উৎসবে বিশেষ ছাপ ফেলে।

বিয়ের ঠিক আগে এস্তোনিয়ার কনেরা তাঁদের বান্ধবীদের সাহচর্যে সারাদিন ধরে মোজা ও দস্তানা বুনে ভবিষ্যতের জন্য জড়ো করেন। বিবাহ-যাত্রার পথে খোলা ছোরা হাতে একজন বিশেষ অশ্বারোহী রক্ষী তাঁকে পাহারা দেন; আর বিয়ের ঠিক আগে কনেকে লুকিয়ে ফেলা হয়, বরকে ঘর বা আঙিনা থেকে তাকে খুঁজে বের করতে হয়। এখানকার বৈবাহিক আচার অনুষ্ঠানের মধ্যে বরের ও কনের বন্ধুদের মধ্যে মল্লযুদ্ধের প্রতিযোগিতাও আছে সমস্ত আত্মীয় স্বজন বন্ধুবান্ধবের উপস্থিতিতে কনের কোমর ঘিরে একটি এপ্রন এবং থুতনি পর্যন্ত ঘিরে একটি টুপি পরিয়ে দেওয়া হয়, আর সেই মুহূর্ত থেকে তিনি হন গৃহকর্ত্রী!

মোলদাভিয়ার গ্রামাঞ্চলে একজন বার্তাবহ বরের আগমন ঘোষণা করেন। তিনি বরের সৌন্দর্য ও গুণ বর্ণনা করে কবিতা আবৃত্তি করেন। প্রধান বিবাহ ক্রিয়া থেকে ফিরে বিবাহ-শোভাযাত্রা চারবার বিবাহ-ভোজের টেবিল প্রদক্ষিণ ক'রে তারপর খেতে বসে।

গুর্জীয় বিবাহ পুরানো প্রথা অনুযায়ী অনুষ্ঠিত হয়। একদল কদমে-ছোটা ঘোড়সওয়ার, যাদের বলা হয় জিগিৎ, তাঁরা বিবাহ-শোভাযাত্রার কাছে

আসেন। খোলা তলোয়ার নিয়ে তাঁরা শোভাযাত্রার দু'ধারে দু' সারিতে দাঁড়িয়ে যান। তারপর তলোয়ারে তলোয়ারে ঠেকিয়ে মাথার উপর দিয়ে একটি খিলান-ওয়ালা পথের মত তৈরী করেন—নববিবাহিতদের সেই তলোয়ারের খিলানের তলা দিয়ে যেতে হয়! বিবাহের কর্মসূচীতে এখানে ঘোড়দৌড়, মল্লযুদ্ধ, নিখুঁত বন্দুক ছোঁড়া জজিয়ার উত্তেজনাপূর্ণ ঘূর্ণী-নাচ প্রভৃতি উৎসবকে আরও আনন্দোচ্ছল করে তোলে, তাছাড়া গান তো সারাক্ষণই চলে।

কাজাখস্তানেও ঘোড়দৌড় বিয়ের একটি অঙ্গ। তবে সেখানে ছোটরা ছাগলের দৌড় করায়। বিবাহ-ভোজের শুরুতে বরকনে একটি পানপাত্র থেকে বহুক্ষণ ধরে একত্রে জলপান করেন—এ হল তাঁদের "জীবনকে চিরতরে জোড়া"র প্রতীক।

বিপ্লবের আগে কাজাখদের মধ্যে এবং মধ্য এশিয়ার অন্যান্য জাতির মধ্যেও একটি প্রথা চালু ছিল, তাতে বরকে কনের বাবার হাতে কনে-পণের টাকা দিতে হত। এই অর্থ দেবার জন্য দরিদ্র তরুণকে অনেক সময়ে গবাদিপশুর ধনী মালিকদের কাছে নিজেকে বাঁধা দিতে হত। অপ্রাপ্তবয়স্কা মেয়ের বিয়ে, তরুণ তরুণীদের বিনা-সম্মতিতে বিয়ে ইত্যাদি আরও অনেক পুরানো প্রথার মত এ-প্রথাকেও চিরতরে বিদায় নিতে হয়েছে। কিন্তু যেসব পুরানো আচার কৌতুক, আনন্দ ও সুখ দেয়, সেগুলিকে তরুণ-তরুণীরা সানন্দে বজায় রেখেছেন।"

## রুশদের কবিতা পাঠ

ছুটির দিনে, শনি-রবিবারে পার্কে, নদীর তীরে, গ্রামে খেতের ধারে সবুজ ঘাসের ওপর অনেককে দেখা যাবে বই নিয়ে শুয়ে বা বসে পড়ছেন। প্রকৃতি-দেবীর শোভা উপভোগ করতে করতে গল্প-উপন্যাস কিংবা কবিতার বই পড়তে যে কি ভাল লাগে অভিজ্ঞতা না থাকলে বোঝা যাবে না।

ইউরোপের অন্য জাতের তুলনায় রুশরা কবিতা পাঠে সবার ওপর যায়।

ওদের কাছে বসন্তের শেষ থেকে গ্রীষ্মকালটা সবচেয়ে বেশী আরাম দায়ক। তাই মস্কো লেনিনগ্রাদের পার্কে পার্কে দেখা যাবে বহু নরনারী কবিতার বই নিয়ে নিবিষ্ট মনে পড়ে যাচ্ছে, নয়তো নিজের মনে আবৃত্তি করে চলেছে।

প্রতি বছরে রবীন্দ্র জন্মোৎসব উপলক্ষে কবির দল কবিতা পাঠ করে থাকেন। আমাদের কবিতা পাঠ আর ওদের কবিতা পাঠ এক ধরণের নয়। কলকাতার পার্কে ক'জনকে দেখা যাবে কবিতার বই নিয়ে বসে আছে? হয়ত একটিও নয়। অবশ্য কলকাতার পার্কগুলোকে ইউরোপের কোনো শহরের পার্কের সঙ্গে তুলনা করাটাও উচিত হবে না। এখনকার কলকাতার অধিকাংশ পার্ক-ই জঞ্জালের ডিপোতে পরিণত হয়েছে। জঞ্জালের ডিপোর পাশে কার আর সাধ হয় কবিতা পাঠে? সদিচ্ছা থাকলেও অনুপ্রেরণা কখনই আসতে পারে না।

আমাদের যত কবি ও কবিতা পত্রিকা আছে ঠিক সেই পরিমাণে কবিতা পাঠের ব্যবস্থা নেই। ওদেশের কবিতা আবৃত্তি ধারাই ভিন্ন। সাধারণতঃ কবিরা আবৃত্তি করে না। পেশাদার শিল্পীরা সঙ্গীত সহযোগে এমনভাবে আবৃত্তি করে, শুনলে মনে হবে যেন অভিনয় হচ্ছে। রুশরা এ বিষয়ে অনন্য। সাধারণ শ্রমিক, কর্মচারী, ছাত্র-ছাত্রীকে আমি দেখেছি গ্রীষ্মকালে নিজেদের ছোট আড্ডাখানায় নাটকীয় ভঙ্গীতে কবিতা আবৃত্তি করতে। গ্রীষ্মকালে পার্কে কবিতা আবৃত্তি হয় বটে, কিন্তু বছরের বাকী সময় পার্কে বিচরণ করা মোটেই আরামদায়ক নয়। ঠাণ্ডায় জমে যাবার জোগাড়। তাই সে সময়ে অনেকের বাড়ীতে কাফেতে কনসার্ট হলে হয় কবিতা আবৃত্তি।

জুলাই মাসের ভরা গ্রীষ্মে এক দুপুরে এক বন্ধুকে নিয়ে মস্কোর সোকোলনিকি পার্কে বেড়াচ্ছি। একটি বেঞ্চে দেখি একটি মেয়ে বসে কি যেন পড়ছে। একটু দূরে দেখি আরেকটা বেঞ্চে আরও দুজন বই নিয়ে ধ্যানস্থ। আমার কৌতূহল আরও বাড়ল। আমার সঙ্গীকে নিয়ে উঁকি মেরে দেখি মেয়েটি বিড়-বিড় করে পড়ে চলেছে। সঙ্গী দোভাষীর কাজ করছিলেন। জানা গেল, মেয়েটি সেক্সপিয়রের রুশ অনুবাদ পড়ছে।

সে দিনটা ছিল রবিবার। আলাপে জানলাম মেয়েটির নাম নিনা। একটি কারখানায় কাজ করে। ছুটির দিনে এই গ্রীষ্মের আমেজে সোকোলনিকির পার্কে সে প্রায়ই একাকী বসে কবিতা পাঠে আনন্দ উপভোগ করে। নিনাই বললো, দেখুন না, সামনের বেঞ্চিতে দুজন যা পড়ছেন তা নিশ্চয়ই কবিতা।

আমাদের কৌতূহল আরও বাড়ল। কোনো ভনিতা না করেই সামনের বেঞ্চিতে দুজনকে জিজ্ঞাসা করলাম কি পড়ছেন?

উত্তর এলো—ইভ্‌তুশেংকো।

আমি ওদের সঙ্গে আলাপ জুড়ে দিলাম। তাদের মধ্যে থেকে একটি ছেলে বললে—কবিতা আবৃত্তি শুনবেন। চলুন আমার সঙ্গে।

বিরাট সেই সোকোলনিকি পার্কের এক কোণায় গিয়ে দেখি একটি ছোট ষ্টেজে মাইকের সামনে একজন হাত নেড়ে কবিতা আবৃত্তি করে চলেছে। তার সঙ্গে চলছে পিয়ানো। পিয়ানো থামলে চলে গীটার। ষ্টেজের সামনে শ' দেড়েক শ্রোতা মুগ্ধ হয়ে শুনছে। একটি আবৃত্তি শেষ হতেই হাততালি। আইভান নামে সেই ছেলেটি জানাল মস্কোয় কয়েকটা কাফে ও কনসার্ট হলে প্রায়ই কবিদের নিজস্ব আবৃত্তি হয়ে থাকে।

খোঁজ নিয়ে একদিন গেলাম একটি ছোট হলে, জনা চারেক তরুণ কবির কবিতা আবৃত্তি হল প্রথমে। তারপর ডায়াসে এলেন স্বয়ং কবি ইভ্‌তুশেংকো। ইভ্‌তুশেংকোর নাম সোভিয়েত ইউনিয়ন জোড়া। লণ্ডন-প্যারিসে ইভ্‌তুশেংকোর জনপ্রিয়তা কম নয়। ইভ্‌তুশেংকোর মুখে কবিতা, হাত নাড়ার মাধ্যমে শিল্পী মনের ভঙ্গিমা শ্রোতাদের মুগ্ধ করে রাখল।

কবিতা আবৃত্তি শুনতে যে অত ভীড় হয় তা রাশিয়া না গেলে বোঝা যাবে না।

আইভান নামে ছেলেটি জানাল সে লেনিনগ্রাদের ছেলে। তারই মুখে শুনলাম লেনিনগ্রাদে সাংস্কৃতিক জীবন আরও জমজমাট। শীতকালে কয়েকটা কাফে-রেস্তোরাঁয় বসে কবি সম্মেলন। কবিদের মুখে কবিতা পাঠ শুনতে সে কি ভীড়।

ফ্রান্সে কবির সংখ্যা যদিও বেশী কিন্তু সে পরিমাণে কবিতা পাঠ হয় না। অতি আধুনিক কবিদের কবিতা সাধারণতঃ আবৃত্তি করে খ্যাতনামা শিল্পীরা বিভিন্ন কনসার্ট হল কিংবা থিয়েটারে। এদের মধ্যে সবার প্রিয় হল ঈভ্‌ মোনত। ঈভ্‌ মোনত সিনেমা-থিয়েটারের খ্যাতনামা অভিনেতা এবং সু-গায়ক। আধুনিক ফরাসী কবিদের কবিতা আবৃত্তি তিনি যখনই করতেন কোনো থিয়েটার হলে বিজ্ঞাপন প্রচারিত হত তিন মাস আগে। আর টিকিট বিক্রি সুরু হয়ে যেত মাসখানেক আগে থেকে। সাধারণতঃ জানুয়ারী-ফেব্রুয়ারীর শীতেই জমে ভাল।

বিরাট অর্কেষ্ট্রার সঙ্গীতের সঙ্গে, কখনো শুধু পিয়ানো বা গীটারের সঙ্গে কবিতা আবৃত্তি শ্রোতাদের মুগ্ধ করে রাখত। মাক্স জাকব, পল এলুয়া আরাগ, জাক্ প্রেভরের কবিতা তিনি এমন অঙ্গভঙ্গী করে আবৃত্তি করতেন দেখলে মনে হয় যেন অভিনয় করছেন। দুটো ঘণ্টা যে কিভাবে কেটে যেত তা টেরই পেতাম না।

ল্যাটিন কোয়ার্টারে অর্থাৎ বিশ্ববিদ্যালয় পাড়ায় ছোকরা ফরাসী কবিদের আবৃত্তি শুনেছি ছোট রেস্তোরাঁ-কাফেতে। তারা অনেকটা চারণ কবিদের মতন গীটার বাজিয়ে আবৃত্তি করত। কখনো সেগুলো শোনাতো আধুনিক গানের মতন।

ইউরোপের সব দেশেই কবিতা পাঠ চিরকেলে ব্যাপার। জনসাধারণ ভালবাসে বলেই কবিতা আবৃত্তি সেখানে সার্থক। তাই সে অত জনপ্রিয়তা লাভ করেছে।

## রুশদের চোখে একবিংশ শতাব্দীর পৃথিবী

বিংশ শতাব্দীর শেষ হতে এখনও ত্রিশ বছর বাকী। এরই মধ্যে একবিংশ শতাব্দীর চিন্তা দেখা দিয়েছে ইউরোপ আমেরিকার চিন্তাশীল মহলে। এ বিষয়ে আমেরিকাই একটু বেশী অগ্রণী। বছর তিনেকের মধ্যে গোটা পনের ভাল ভাল বইও প্রকাশিত হয়েছে একবিংশ শতাব্দীর জীবনযাত্রা কেমন হবে সে সম্বন্ধে। মূলত অর্থনৈতিক ও বৈজ্ঞানিক কলাকৌশলের ভূমিকা ও প্রগতি কোন দিকে যাবে তারই পরিকল্পনা দেখানো হয়েছে এই সব বইএ। এদের মধ্যে মার্কিণ লেখক হারম্যান কাহান এর '২০০০' খ্রীস্টাব্দ বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ইতিমধ্যে একটি ফরাসী সাময়িক পত্র '২০০০' ও প্রকাশিত হয়েছে। এখন যাদের বয়স বিশের কোঠার মধ্যে তারা ২০০০ খ্রীস্টাব্দে ৪৫ থেকে ৫০ বছরে পা দেবে। তারাই একবিংশ শতাব্দীর গোড়াপত্তন করবে। সুতরাং একালের তরুণদের মনোভাব-এর ওপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে। তাদের অনেকেই বলেছে, একবিংশ শতাব্দীতে তারা চাইবে আরও সুখ এবং সুখ মানো যা কিছু

চাই তা কেনার মত অঢেল অর্থ পাওয়া। সুখের অর্থ হল অর্থপূর্ণ কাজকর্মে নিযুক্ত হবার নিজেকে মুক্ত বলে অনুভব করার ও নিজের ভাগ্যবিধাতা হবার সম্ভাবনা।

অধিকাংশ চিন্তাশীল একবিংশ শতাব্দীর কথা আলোচনা করতে গিয়ে অর্থনৈতিক প্রগতির কথাই বলেছেন, যেমন হ্যারম্যান কাহান বলেছেন ২০০০ খ্রীস্টাব্দে গড়পড়তা বাৎসরিক আয়ের হিসেবে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের সমান হবে পশ্চিম জার্মাণী, ব্রিটেন, ফ্রান্স ও জাপান। কিন্তু ভারতবর্ষ এখন যেমন আছে তখনও তেমনি থাকবে। তার ব্যাখ্যা করতে গিয়ে তিনি বলেছেন যে, ভারতের শিল্প ও অর্থনীতির গতি এখনও যেভাবে এগুচ্ছে ঠিক সেইভাবে যদি এগোয় এবং যে হারে লোকসংখ্যা বাড়ছে সে হারে যদি লোকসংখ্যা বাড়ে তাহলে ভারতের অর্থনৈতিক প্রগতি কখনই লোকসংখ্যা বৃদ্ধির হারকে ছাপিয়ে এগুতে পারবে না। সর্বোপরি রয়েছে খাদ্য সমস্যা।

বিশ্ব ব্যাঙ্কের তথ্য থেকে জানা যায়, আন্তর্জাতিক আয়ের পরিমাপ অনুসারে মাথা পিছু জাতীয় উৎপাদন ও সম্পদ হিসেবে বর্তমানে ভারতের স্থান ৯৩তম। সর্বপ্রথম স্থান অধিকার করে আছে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র—৩,৫২০ ডলার, সুইডেন—২,২৭০ ডলার, সুইজারল্যাণ্ড ও কানাডা—২,২০০ ডলার করে।

এশিয় দেশগুলোর মধ্যে প্রথম স্থান অধিকার করেছে ইস্রায়েল—১১৬০ ডলার ও জাপান ৮৬০ ডলার। পিছিয়ে পড়া দেশগুলোর মধ্যে আছে ভারত, পাকিস্তান, কেনিয়া, মালয়েশিয়া ও ইয়েমোন এদের হল ৯০ ডলার।

একদল ধনবিজ্ঞানী বলছে যেভাবে বৈজ্ঞানিক প্রগতি হচ্ছে ইউরোপ ও ও আমেরিকায়, তার ফলে ইউরোপের কয়েকটি দেশ মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের সমান হয়ে যাবে ২০০০ খ্রীস্টাব্দে মাথা পিছু আয়ের হিসেবে। মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের এখন মাথা পিছু আয় চার হাজার ডলারের কাছে, ব্রিটেন, পশ্চিম জার্মাণী, ফ্রান্স, সুইডেন ইত্যাদি দেশগুলোর মাথা পিছু আয় ১৩০০ ডলার থেকে ২০০০ ডলারের মধ্যে। তারা আগামী ত্রিশ বছরের মধ্যে আয় দ্বিগুণ করতে সক্ষম হবে। কিন্তু ভারতবর্ষ কি ১০০ ডলার থেকে হাজার বা পনের শ' ডলারে পৌছতে পারবে? এটাই বড় প্রশ্ন।

ত্রিশ বছর পরে একবিংশ শতাব্দীর শুরু হবে। এখন তার জন্যে মাথা ঘামিয়ে লাভ কি? এ প্রশ্ন অনেকেই করতে পারেন। তার উত্তরে কিছু

চিন্তাশীল বলেছেন, মানব ইতিহাসে বিংশ শতাব্দী নিদর্শন স্বরূপ। এই শতাব্দীতে ঘটেছে দু'দুটো মহাযুদ্ধ। রুশ বিপ্লব ও সমাজতন্ত্রবাদ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে বিংশ শতাব্দীতে পদদলিত ও পরাধীন দেশগুলো স্বাধীন হয়েছে। মানব জাতিকে লোপাট করে দিতে পারে যে সব অস্ত্র যেমন এ্যাটম হাইড্রোজেন বোমা তারও স্থত্রপাত এই শতাব্দীতে। এর থেকেই সুরু পারমানবিক শক্তি। তারপর রকেট স্পুটনিক এবং মহাকাশ জয়। মানুষ চাঁদে পৌছেছে এই শতাব্দীর যাট দশকে। বিজ্ঞানের প্রগতি যেভাবে হচ্ছে তার ফলে অনেক অসম্ভব সম্ভব হতে চলেছে। তাই চিন্তাশীলদের দৃষ্টি এখন সুদূরের এক বিংশ শতাব্দীর পথে। সত্তর দশকে আমরা পা দিয়েছি। কিন্তু তাই বলে কি সব দেশের জনগণের আর্থিক উন্নতি হয়েছে?

২০০০ খ্রীস্টাব্দে কি কি ঘটবে সে সম্বন্ধে রুশ চিন্তাশীল মহলও অনেক তথ্য পরিবেশন করেছে। এখন ২০০০ খ্রীস্টাব্দের চিন্তা শুধু মার্কিন চিন্তাশীলদেরই একচেটে ব্যাপার নয়। রুশ ধনবিজ্ঞানি ডঃ আলেকসেই লেভকোভ্স্কি বলেছেন সমস্যাটা "তৃতীয় দুনিয়াকে" নিয়ে। প্রথম দুনিয়া ইউরোপ-আমেরিকার ধনতান্ত্রিক দেশগুলো দ্বিতীয় দুনিয়া সমাজতান্ত্রিক দেশ আর তৃতীয় দুনিয়া হল সদ্য স্বাধীন হওয়া অনগ্রসর দেশগুলো। এদের মধ্যে ভারতবর্ষ রয়েছে।

ডঃ লেভকোভ্স্কি বলেছেন, ১৯২০ সালে জনসংখ্যা ছিল বিশ্বে ১৯০ কোটি, ১৯৬০ সালে ৩০০ কোটি আর ২০০০ সালে হবে ৬০০ কোটিতে। ২০৫০ সালে অঙ্কটি গিয়ে দাঁড়াবে ১,১০০ কোটির ঘরে।

১৯২০ সাল থেকে ১৯৬০ সালের মধ্যে অর্থনৈতিক দিক থেকে অগ্রসর দেশগুলোর জনসংখ্যা ৬১ কোটি ৪০ লক্ষ থেকে বেড়ে হয়েছে ৯৭ কোটি ৬০ লক্ষ। ২০০০ সাল নাগাদ অঙ্কটি ১৫০ কোটি হওয়া উচিত। তৃতীয় দুনিয়া অর্থাৎ উন্নয়নশীল দেশ বলে এখন যেসব দেশে পরিচিত এই চার দশকে তাদের জনসংখ্যা ১২৮ কোটি ৭০ লক্ষ থেকে বেড়ে হয়েছে ২০২ কোটি ২০ লক্ষ এবং ২০০০ সালের মধ্যে সেটা ৪৭০ কোটির কাছাকাছি পৌছবে। গড় হিসাবের ভিত্তিতে ২১শ শতাব্দীর মাঝামাঝি অগ্রসর দেশগুলোর জনসংখ্যা ২০০ কোটি এবং উন্নয়নশীল দেশগুলোর জনসংখ্যা ৯০০ কোটি হবে বলে ধরা হয়েছে।

যে সমস্যা সবাইকে ভাবিয়ে তুলেছে সেটা হল খাদ্যে ঘাটতি। বর্তমান অগ্রসর দেশগুলোর মাথাপিছু যে খাদ্য ব্যবহৃত হয় তার কাছাকাছি যেতে

২০০০ খ্রীস্টাব্দের গোড়ায় পৌঁছতে হবে তৃতীয় দুনিয়াকে। এবং ঠিক তখন অগ্রসর দেশগুলোর সমস্যা হবে অধিক খাদ্য উৎপাদন।

২০০০ খ্রীস্টাব্দ সুরু হওয়ার আগেই নাকি তৃতীয় দুনিয়া বা অনগ্রসর দেশগুলোতে দুর্ভিক্ষ হতে বাধ্য বলে সাবধান করে দিয়ে বলেছেন কয়েকজন মার্কিন ধনবিজ্ঞানী। ক্যালিফোর্ণিয়ার বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক গ্রেটন ক্লাউড বলেছেন, জন-বিস্ফোরণ রোধ করতে না পারলে তৃতীয় দুনিয়ায় দুর্ভিক্ষ হতে বাধ্য ২০০০ খ্রীস্টাব্দে। কিন্তু ২০০০ খ্রীস্টাব্দে গোটা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পঁচাশি ভাগ জনসংখ্যার বাস করবে শহরে। তারা শুধু গ্রামে যাবে চাষবাস করতে। অথবা গ্রামের মধ্যে ছোট ছোট অতি আধুনিক শহর গড়ে উঠবে। বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি প্রয়োগ খাটুনি কমবে কিন্তু উৎপাদন বাড়বে। তবে বিপদও বাড়বে, যেমন গাড়ীর সংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে বিষাক্ত গ্যাসও বাড়বে। তাতে জনসাধারণের স্বাস্থ্য খারাপ হবে। এবং সেগুলো রোধ করতে মার্কিন সরকারকে ব্যয় করতে হবে বছরে কয়েক শ' কোটি টাকা।

সারা বিশ্বময় এখন চিন্তাশীল মহল আলোচিত হচ্ছে, ২০০০ খ্রীস্টাব্দের অগ্রসর দেশগুলোর প্রগতিতো চরমে উঠবে কিন্তু তৃতীয় দুনিয়ার দরিদ্র মানুষের কী হবে? তারা কি দুর্ভিক্ষের কবলেই দিন কাটাবে?

## সাইবেরিয়ায় উন্নয়ন

আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে দিনকাল পালটেছে। কোন রাষ্ট্রই আর আজকাল বন্ধ্যা নীতি নিয়ে চলে না। সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র গোষ্ঠীর সঙ্গে মার্কিন গোষ্ঠীর সংযোগ বৃদ্ধি পেয়েছে। এই দুই বিরোধী গোষ্ঠীর মধ্যে অর্থনৈতিক-বাণিজ্যিক লেনদেন বাড়ছে। এইসব কারণেই বিশ্বযুদ্ধ বাধার সম্ভাবনা দিনকে দিন কমেই যাচ্ছে। ছোটখাট আঞ্চলিক যুদ্ধ আগেও ছিল এবং পরেও থাকবে। ভয়াবহ বিশ্বযুদ্ধের আশঙ্কা এখন আর নেই।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের ধ্বংসস্তূপ থেকে আজ জাপান বিশ্বের এক বৃহৎ অর্থনৈতিক শক্তি রূপে দাঁড়িয়েছে। ঠিক তেমনি ভাবে সব দিক দিয়ে বৃহৎ শক্তি-

রূপে গণ্য হয়েছে সোভিয়েত ইউনিয়ন। এই দুই দেশের সহযোগিতায় এক কালের নির্বাসন ভূমি সাইবেরিয়ায় আরও শিল্প গড়ে উঠতে চলেছে। এককালে সাইবেরিয়ার নামে হৃদকম্প হত। রুশ সম্রাট জারের আমলে নির্বাসন দণ্ড দিয়ে পাঠানো হত সাইবেরিয়ায়। ঘন বন-জঙ্গল আর তুষারপাত যার বৈশিষ্ট্য সেই সাইবেরিয়ায় আজ কলকারখানা গড়ে উঠেছে। গড়ে উঠেছে সেখানে নতুন জনপদ।

সাইবেরিয়াকে তিনটি অর্থনৈতিক ভাগে ভাগ করা হয়েছে পশ্চিম, মধ্য ও পূর্ব সাইবেরিয়া। পশ্চিম ও মধ্য সাইবেরিয়ায় খনিজ সম্পদ আহরণের কাজ; পেট্রল উৎপাদন, বিদ্যুৎ শক্তি উৎপাদন, কাগজ ও কাগজের মণ্ড ও কলকারখানার কাজ শুরু করেছেন সোভিয়েত সরকার বিশ বছর আগে। পূর্ব সাইবেরিয়ার কিছু অঞ্চলের অর্থনৈতিক কাজের ভার দিয়েছে সোভিয়েত সরকার জাপানকে। সেই জন্যে চুক্তিও হয়ে গেছে।

পূর্ব সাইবেরিয়াকে শিল্পোন্নত করে গড়ে তুলতে হলে যন্ত্রপাতি পাঠাতে হবে সোভিয়েত সরকারকে মস্কো বা লেনিনগ্রাদ অঞ্চল থেকে। সেখান থেকে সময় লাগে পূর্ব সাইবেরিয়া পৌছতে দশ দিন। কিন্তু জাপান থেকে লাগে মাত্র দেড় দিন। ভৌগোলিক দূরত্ব এড়াবার জন্যেই সোভিয়েত ইউনিয়নের সঙ্গে জাপানের এই সহযোগিতা। তাছাড়া জাপানের স্বার্থ জড়িয়ে আছে সবচেয়ে বেশী। জাপানের খনিজ সম্পদ নেই বললেই চলে। লৌহ, কয়লা পেট্রল ইত্যাদি জাপানকে বিদেশ থেকে কিনতে হয়। জাপান কয়লা কেনে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র থেকে টন প্রতি আট ডলার দাম দিয়ে, কিন্তু পূর্ব সাইবেরিয়া থেকে সে কয়লা কিনবে টন প্রতি তিন ডলারে।

পূর্ব সাইবেরিয়ায় জাপান অর্থনৈতিক সহযোগিতা চালালে সে লাভবান হবে। জাপানের শিল্প-কারখানা চালাতে যে কাঁচা মালের প্রয়োজন হয় তার নব্বুই ভাগ আসে বিদেশ হতে। বিদেশ থেকে জাপান আমদানি করে লোহা, তামা, নিকেল, টাংস্টেন, টিন, ম্যাংগানিজ, মলিবডনাম, পেট্রল, গ্যাস, কয়লা ইত্যাদি। এর কিছু কিছু জিনিস জাপান ভারত থেকেও কেনে। আগামী দশ বছরে জাপানের পেট্রলের প্রয়োজন বাড়বে ২৩০ মিলিয়ন কিলোলিটার থেকে ৮০০ মিলিয়ন কিলোলিটারে। ওপরে যে সব জিনিসের নাম করেছি এবং পেট্রলের চাহিদার অনেক খানি পূরণ হবে সাইবেরিয়া থেকে। তাই সাইবেরিয়া উন্নয়ন কাজে জাপানের এত আগ্রহ। পূর্ব সাইবেরিয়া উন্নয়নকল্পে জাপান

প্রথমে খরচ করবে এক হাজার মিলিয়ন ডলার। তারপর ধাপে ধাপে জাপান ও সোভিয়েত ইউনিয়ন যুক্ত প্রচেষ্টায় পূর্ব সাইবেরিয়া উন্নয়ন প্রকল্পে পঞ্চাশ হাজার মিলিয়ন ডলার খাটাবেন।

সাইবেরিয়ায় অর্থনৈতিক উন্নয়ন প্রকল্পে ইতিমধ্যে সোভিয়েত সরকার পঞ্চাশ হাজার মিলিয়ন ডলার লগ্নী করেছেন। সাইবেরিয়ায় শিল্পোন্নয়নে বিদেশী সহযোগিতার প্ল্যান করেছিলেন ক্রুশ্চেভ ১৯৫৯ সালে। তাঁর সেই প্ল্যান পরে কার্যকরী করেন ব্রেজনেভ-কোসিগিন ১৯৬৬ সালে। সেই থেকে জাপান ও সোভিয়েত ইউনিয়নের মধ্যে অনেকগুলো চুক্তি সাধিত হয়েছে।

সাইবেরিয়ায় উন্নয়ন প্রকল্পের কাজ সুরু হয়েছে ১৯৫৪-৫৮ সালের পাঁচ সালা পরিকল্পনায়। সাইবেরিয়ায় নির্মাণ কাজ সুরু হয় ১৯৫৯-৬৫ সালের পাঁচ সালা পরিকল্পনায়, তখন নির্মিত হয় লোহার কারখানা, জল-বিদ্যুৎ কেন্দ্র, রাসায়নিক কারখানা, পেট্রল উত্তোলন ও শোধনাগার, গ্যাস উত্তোলন। এই কাজের বিপুল আকার ধারণ করে ১৯৬৬-৭০ সালে। ওই কয় বছরে সোভিয়েত সরকার তার রাজস্বের ১৬-২ ভাগ ব্যয় করেছেন সাইবেরিয়া উন্নয়ন প্রকল্পে অর্থাৎ একান্ন হাজার মিলিয়ান রুবল। তার ফলে পশ্চিম সাইবেরিয়া শিল্পোৎপাদন বৃদ্ধি হয়েছে শতকরা ৮-৮ ভাগ এবং পূর্ব সাইবেরিয়ায় ৯-৬ ভাগ। সমগ্র সোভিয়েত ইউনিয়নে ঠিক সেই সময়ে শিল্পোৎপাদনের হিসেব ছিল শতকরা ৮-৬ ভাগ। নবম পাঁচ সালা পরিকল্পনা ১৯৭১-৭৫-এ সমগ্র সাইবেরিয়া অঞ্চলে রাসায়নিক কারখানা, বিদ্যুৎ কেন্দ্র, গাছ কাটা, কাঠের উৎপাদন, কাগজের মণ্ড ও কাগজ তৈরীর হিসেব বেড়ে দ্বিগুণ হয়েছে। সেই সঙ্গে হয়েছে নতুন নতুন বন্দরের আবির্ভাব।

জাপানের সঙ্গে সোভিয়েত ইউনিয়নের কয়েকটি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে, যেমন ১৯৬৬ সালের জানুয়ারী মাসে, ১৯৬৭ সালে জুন মাসে ১৯৬৮ সালের ডিসেম্বরে, ১৯৭০ সালের ফেব্রুয়ারীতে, ১৯৭১ ও ১৯৭২ সালে। এই সব চুক্তির ফলে জাপান র‍্যাঙ্গেল উপসাগরে একটি বন্দর নির্মাণ করবে। গ্যাস ও পেট্রল উত্তোলন করে পাইপ দিয়ে নিয়ে যাবে এই বন্দরে। এবং এই বন্দর দিয়ে জাপানের তৈরী বহু জিনিষপত্র রপ্তানী করবে পূর্ব সাইবেরিয়ায়। এর ফলে সাইবেরিয়ার ওই অঞ্চল অর্থনৈতিক প্রসার বৃদ্ধি পাবে এবং দুই দেশই লাভবান হবে।

# তিন যুগের তিন দিক্‌পাল

স্তালিন ও ক্রুশ্চেভকে নিয়ে বহু তর্ক-বিতর্ক হয়েছে। এখনও চলেছে সে তর্ক। এঁরা দুজনেই বিতর্কিত পুরুষ। এই দুই বিতর্কিত পুরুষকে নিয়ে দেশ-বিদেশের সর্বত্রই দেখেছি সমান কৌতূহল।

কিন্তু লেনিন তর্ক-বিতর্কের উর্দ্ধে। লেনিন ছিলেন পরিপূর্ণ মহান। একটি মহান দেশের মহান নেতা হবার সবগুলো গুণই তাঁর ছিল। এক কথায় বর্তমানের সোভিয়েত ইউনিয়নের জনক লেনিন। অনেক দেশের অনেক আদর্শবাদী বিপ্লবী জীবদ্দশায় তাঁর স্বপ্ন সফল হতে দেখেন নি। তেমন দৃষ্টান্ত বিরল নয়। একমাত্র লেনিন তার ব্যতিক্রম।

লেনিন তাঁর দেশে সামন্ততন্ত্রবাদ ও পুঁজিবাদ ঝাঁটিয়ে বিদায় দিয়েছেন, প্রতিষ্ঠা করেছেন নিজের হাতে সমাজতন্ত্রবাদ। শাসনযন্ত্র পরিচালনা করেছেন নিজের হাতে। যখন তিনি ক্ষমতায় আসীন তখন পশ্চিমের সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলো তাঁর বিরুদ্ধে কত না ষড়যন্ত্র করেছে, করেছে তাঁর বিরুদ্ধে অপপ্রচার। লেনিন যখন বেঁচে তখন সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলো কতবারই না তাঁর মৃত্যু খবর রটনা করেছে। বিশ্বের অন্যদেশে যাতে সমাজতন্ত্রবাদ না প্রতিষ্ঠিত হয় তার জন্য লেনিনের বিরুদ্ধে ছিল পশ্চিমী শক্তির ষড়যন্ত্র ও অপপ্রচার কৌশল। সব অপ-প্রচেষ্টা ব্যর্থ করে লেনিনের জয় যাত্রা চলেছে সারা বিশ্ব জুড়ে।

শুধু রাশিয়ায় নয়, অনেক দেশেই দেখেছি লেনিন সম্বন্ধে জনগণের অশেষ শ্রদ্ধা। রাশিয়ায় আমি কোনোদিন কারুর কাছে লেনিনের সম্বন্ধে তর্ক-বিতর্ক শুনিনি। লেনিন তাদের কাছে সব তর্ক-বিতর্কের উর্দ্ধে। সবাই তাঁকে শ্রদ্ধা করেন। লেনিন সর্বজনপ্রিয়।

লেনিনের জনপ্রিয়তা বোঝা যাবে মস্কোর রেড স্কোয়ারে গেলে। লেনিন সমাধি মন্দিরের সামনে দেখা যাবে হাজার হাজার নর-নারীর বিরাট লাইন। কি গ্রীষ্ম কি শীত সব সময়েই দেখেছি দর্শন প্রার্থীর ভিড়। অফিস-আদালতে-রেল স্টেশনে যেখানেই গেছি সেখানে দেখেছি লেনিনের ছবি। • প্রায় প্রত্যেক

শহরে একটি করে লেনিনের মূর্তি। ছোট ছোট ছেলে-মেয়েদের বুকে ঝুলছে লেনিনের ছবি ওয়ালা ব্যাজ্।

লেনিনের স্মৃতি জাগ্রত রয়েছে প্রতিটি সোভিয়েত জনগণের মনে। লেনিনগ্রাদের যে বাড়িতে বসে লেনিন বিপ্লবী সরকার পরিচালনা করেছিলেন, সেই বাড়িটায় দর্শকের ভিড় লেগেই আছে।

লেনিনকে রুশরা হৃদয় দিয়ে সত্যি সত্যি শ্রদ্ধা-ভক্তি করে। অতখানি শ্রদ্ধা বা ভক্তি আমরা দেখাই নি কোনো ভারতীয় নেতার প্রতি।

লেনিন সম্বন্ধে শ্রদ্ধাভক্তি প্রকাশ করতে দেখেছি আমি বিদেশে বিশেষ করে পশ্চিম ইউরোপে। লেনিন সম্বন্ধে আমি তাদের কোনোদিন দ্বিমত প্রকাশ করতে দেখিনি। সেখানে লেনিন এখনও সবার শ্রদ্ধা আকর্ষণ করেন।

লেনিন শতবার্ষিকী উৎসবের কয়েক বছর আগে প্যারিসে লেনিন নিয়ে অনেক লেখা-লেখি, প্রবন্ধ ও বই প্রকাশিত হয়। প্রাক্ রুশ বিপ্লবের সময় লেনিন যখন পশ্চিম ইউরোপের বিভিন্ন দেশে স্বেচ্ছা নির্বাসিত জীবন যাপন করেছিলেন সে সময়ে তিনি বেশ কিছুদিন আত্মগোপন করে কাটিয়ে ছিলেন প্যারিসে। ওই সময়ে লেনিন প্যারিসে তাঁর ঘাঁটি আগলে ইউরোপের বিভিন্ন দেশে ছড়ান রুশ বিপ্লবীদের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করে চলতেন। লেনিনের এই অজ্ঞাতবাস জীবন অধ্যায়ের বহু না-জানা কাহিনী তখন প্রকাশিত হচ্ছিল প্যারিসের বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায়। আমি তখন প্যারিসে। অনেক আগ্রহ নিয়ে ওগুলো তখন পড়তাম।

প্যারিসের যে পাড়ায় তিনি থাকতেন, যে বাড়িটায় তিনি বাস করতেন সে বাড়িটা এখনও রয়েছে। একটি দরিদ্র পাড়া সেটি, বাড়িটা জরাজীর্ণ। দোতলার ঘরে বসে তিনি লেখা-পড়া করতেন। ওই ঘরেই তিনি বিপ্লবীদের সঙ্গে গোপনে পরামর্শ করতেন। মাঝে মাঝে তিনি ও পাড়ার এক কাফেতে যেতেন কফি-টফি পান করতে। কয়েক বছর আগে ও পাড়ায় পুরোনো বাসিন্দা ও সেই কাফের মালিককে খুঁজে বের করে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়েছিল লেনিন সম্বন্ধে। লেনিন যখন যে পাড়ায় বাস করতেন, তখনকার দিনের কিছু তরুণ-তরুণী, যুবক-যুবতীরা এখন বৃদ্ধ। তাদের অনেকে লেনিনকে কেমন দেখেছিলেন, তাদের কাছে জানা গেছে অনেক খবর। সবাই একবাক্যে বলেছেন লেনিনকে তাঁরা দেখেছেন একজন শান্ত মানুষ হিসাবে। ধীর স্থির প্রকৃতির মানুষ। ব্যবহারে অত্যন্ত সৌজন্যপূর্ণ ও অমায়িক।

যে কাফেতে লেনিন অবসর সময়ে যেতেন সেই কাফের এক পরিচারিকা ছিলেন তখন তরুণী, এখন বৃদ্ধা, তিনি বলেছেন, 'লেনিনকে দেখতাম আকাশের দিকে চেয়ে চেয়ে কি যেন ভাবতেন। তাঁর চোখে দেখতাম বিষাদের ছায়া। বেশী কথা-বার্তা বলতেন না। তাঁর ব্যবহারে পেতাম হৃদয়ের উষ্ণতা। আমরা তখন জানতাম না ইনিই সেই মহামতি লেনিন। এত বড় বিপ্লবী যে কতবড় হৃদয়বান-মানবিক হতে পারে সে ধারণা আমাদের তখন ছিল না।' প্যারিসের যে পাড়ার বাড়িতে লেনিন বাস করতেন সে বাড়িটা আমি কয়েকবার দেখেছি। বাড়ির গায়ে ফলকে লেখা আছে লেনিন এ বাড়িতে বাস করেছিলেন, ইত্যাদি।

স্তালিন ও ক্রুশ্চেভকে নিয়ে বিদেশে যত সোরগোল, তার এক শতাংশ আমি দেখিনি সোভিয়েত দেশে। সোভিয়েত জনগণের কাছে স্তালিন এখন প্রায় বিস্মৃত। আমি অনেককে জিজ্ঞাসা করেছিলাম স্তালিন সম্পর্কে, কাউকে আমি আগ্রহ প্রকাশ করতে দেখিনি। সোভিয়েত ইউনিয়নের জনগণ স্তালিন ক্রুশ্চেভকে নিয়ে মোটেই মাথা ঘামান না। সেদিকে তাঁদের কোনো ভ্রূক্ষেপ নেই।

পশ্চিমের সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলো স্তালিনকে তাদের সুবিধে মতন কল্পলোকে কখনো দেবতা, কখনো বা শয়তান বানাত। স্তালিনকে কেন্দ্র করে নানা কেচ্ছার অপপ্রচার করত সোভিয়েত ইউনিয়নকে ছোট করার জন্যে। তাদের একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল সোভিয়েত ইউনিয়নের নামে কাদা নিক্ষেপ করা এবং এই উদ্দেশ্যেই তারা স্তালিনের নামে নানা কাল্পনিক গল্প রটনা করত।

স্তালিন ও ক্রুশ্চেভের পর সোভিয়েত ইউনিয়নের শাসন যন্ত্র অচল হয়নি। বরং বর্তমান নেতৃবৃন্দের পরিচালনায় সোভিয়েত ইউনিয়নের সর্বাঙ্গীন উন্নতি হচ্ছে। ব্রেজনেভ-পদগোর্নী-কোসিগিনের নেতৃত্বে সোভিয়েত ইউনিয়ন এখন সর্বশক্তিমান রাষ্ট্র হিসেবে পরিগণিত হয়েছে। স্তালিন-ক্রুশ্চেভ যা করতে পারেনি বর্তমান নেতৃবৃন্দ তার চেয়েও অনেক বেশী কাজ করে চলেছেন। সোভিয়েত জনগণ এঁদের নেতৃত্বে খুশী। এঁদের সম্বন্ধে আমি জনগণের শ্রদ্ধা ও সমর্থন রয়েছে তার অজস্র প্রমাণ পেয়েছি।

স্তালিন কন্যা সোয়েৎলানা সম্পর্কে কথা উঠেছিল। সোয়েৎলানা আমেরিকা গেলেন, তাঁর আত্মজীবনী লিখলেন। কিছু পয়সাও রোজগার করলেন। বিয়ে করলেন এবং সে বিয়ে ভাঙলেন। শ্রীমতি লিদিয়া নামে সাংবাদিক বলছিলেন, এত সব ঢং করে কি ফল হল?

শ্রীমতী লিদিয়া বললেন, স্তালিন কন্যা সোয়েৎলানার মাথায় ছিট্ আছে, নইলে কেউ তার নিজের ছেলে-মেয়েকে ছেড়ে আমেরিকায় চলে যায়? লেখক হিসেবে সোয়েৎলানা ব্যর্থতার পরিচয় দিয়েছে। যে টাকা উপার্জন করেছিলেন তিনি তাও এখন ফুরিয়ে গেছে। আমেরিকানরা তাদের কার্য সিদ্ধি করে এখন তাকে পায়ে ঠেলছে। মিঃ পিটার্সকে বিয়ে করে সোয়েৎলানার একটি মেয়ে হল। আবার তার সঙ্গে ডিভোর্সও হল। কতদিন তিনি আর এভাবে থাকবেন। কিছুদিন আগে সোয়েৎলানা তার ছেলে-মেয়েকে টেলিফোন করেছিল, তাদের বলেছিল 'আমি আবার তোমাদের কাছে আসছি।' এর থেকেই মনে হচ্ছে সোয়েৎলানা তার ভুল বুঝতে পেরেছেন, তিনি আবার সোভিয়েত ইউনিয়নে ফিরে আসতে চাইছেন। আমেরিকার সখ তার মিটেছে। কিন্তু কেমন করে তিনি দেশে ফিরবেন সেটাই বড় প্রশ্ন!

আমার মনে হচ্ছে সোয়েৎলানা একূল-ওকূল দুইকূলই হারাল।

১৯৬৭ সালের গোড়ায় যখন সোয়েৎলানার কিছু কিছু লেখা ইউরোপ-আমেরিকার পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত হচ্ছিল তখন ওই সব দেশে বেশ কৌতূহল সৃষ্টি করেছিল। আমি তখন সে সব লেখা পড়েছি। বইটা যখন বেরুল তখন পড়ে দেখলাম, স্তালিনের ব্যক্তিগত জীবনের মতন সোয়েৎলানার জীবনও দুঃখ ও ট্র্যাজেডিতে ভরা। স্তালিনের শেষ জীবন নিয়েই বেশী আলোচনা করেছেন সোয়েৎলানা। তার কিছু অংশ তুলে দিচ্ছি।

সোয়েৎলানা স্তালিনের আত্মজীবনী 'টুয়েন্টি লেটার্স টু এ ফ্রেণ্ড' বইটা বহু ভাষায় প্রকাশিত হয়ে বাজার ছেয়ে ফেলেছে। ইংরেজী সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছে আমেরিকায় ও ব্রিটেনে। ফরাসী সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছে প্যারিসে। ভাষা ও লেখার ভঙ্গী সহজ ও সরল। কোনো মার প্যাঁচ নেই। একটি কথাই বার বার মনে হবে যে, সোভিয়েত ইউনিয়নের সর্বশক্তিমান স্তালিনের পারিবারিক জীবন ছিল অভিশপ্ত। তাকে সুখী জীবন মোটেই বলা যায় না। পারিবারিক অশান্তিতে তিনি সারা জীবন কাটিয়েছেন। একজনের পর একজন স্ত্রী মারা গেছেন। বড় ছেলে মারা গেছে জার্মান বন্দী শিবিরে। ছোট ছেলে মারা গেছে অত্যধিক মদ্যপানে। আর মেয়ের জীবনও তেমন সুখের নয়।

স্তালিন কন্যার আত্মজীবনীতে স্তালিনের শেষ দিনগুলো সম্বন্ধে যে সব ঘটনা বিবৃত হয়েছে সেগুলোর সঙ্গে অনেক সাদৃশ্য আছে ক্রুশ্চেভ বর্ণিত ঘটনার সঙ্গে। মিঃ ক্রুশ্চভ যখন প্রধানমন্ত্রী ছিলেন তখন স্তালিনের শেষ দিন সম্বন্ধে

একটি লেখা ছাপা হয় পারী-মাচ্, পত্রিকায় ১৯৬৩ সালের এপ্রিল মাসে।

ক্রুশ্চভ বর্ণিত ঘটনায় জানা যায় যে, ১৯৫৩ সালের ৫ই মার্চ তারিখে স্তালিন মারা যান। ২রা মার্চ তারিখ তার অবস্থা খারাপের দিকে যায়। ৫ই মার্চের রাত্রে দুঃসংবাদ পৌছান মাত্র সোভিয়েত সরকারের কতিপয় নেতা স্তালিনের বাড়ি পৌছেন। তাঁদের মধ্যে ক্রুশ্চেভও ছিলেন। বড় দুঃখজনক পরিস্থিতির মধ্যে স্তালিন শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। তাঁর কাছে ছিল না তাঁর আত্মীয় স্বজন, ছিল না ছেলে বা মেয়ে। পরিচারিকাদের পরিবেষ্টনে তাঁকে বিদায় নিতে হয়। স্তালিন সবাইকে সন্দেহ করতেন। এমন কী তাঁর চিকিৎসককে পর্যন্ত। তাঁর ঘরগুলোকে সাজান হয়েছিল দুর্গের মতন দুর্ভেদ্য করে। কোন্ রাত্রে কোন্ ঘরে তিনি শুতেন তা অনেকের জানার বাইরে থাকত। ৫ই রাত্রে ক্রেমলিনের নেতারা যখন এসে পৌছেন তখন এক ঘর থেকে আরেক ঘরে যেতে তাঁদের বেশ বেগ পেতে হয়। স্তালিনের জীবনের শেষের দিনগুলো কাটে একান্ত নিঃসঙ্গভাবে। ক্রুশ্চভ বলেছেন যে দু-চারজন মন্ত্রী-নেতা ছাড়া কারুর সঙ্গে তিনি দেখা করতেন না। প্রচুর বই পড়তেন এবং রেকর্ডে গান শুনতেন। রুশ ক্লাসিক সঙ্গীত ভালবাসতেন আর ভালবাসতেন লোক-সঙ্গীত। যে সব গায়কদের গান ভাল লাগত না সে সব রেকর্ডের গায়ে লিখে রাখতেন 'একেবারে বাজে—অখাদ্য' ইত্যাদি গালাগালি। কোনটাতে লিখতেন 'চলতে পারে।' কোনোটাতে বা 'মন্দ নয় ভালোই বলা চলে' ইত্যাদি ইত্যাদি।

স্তালিন সম্বন্ধে নানান কিংবদন্তি প্রচলিত আছে। শ্রীমতী সোয়েৎলানা বলেছেন তার আত্মজীবনীতে—'২রা মার্চ তারিখে স্তালিনের অবস্থা খারাপের দিকে যায় এবং ৫ই শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ। মৃত দেহের পাশে উপবিষ্ট ক্রুশ্চভ, ভরশিলভ, মালেনকভ, বুলগানিন, কাগনোভিচ সবাই ফুঁফিয়ে কাঁদতে থাকেন। একমাত্র বেরিয়া কোনো রকমের দুঃখ প্রকাশ করেন না। বুলগানিন ও মিকোইয়ান আমায় সান্ত্বনা দিতে থাকেন। যে ঘরে বাবা মারা যান সে ঘরের এক কোণায় দেখি এক গাদা গানের রেকর্ড। জীবনের শেষের দিনগুলো তিনি একাই থাকতেন এবং সঙ্গীতে ডুবে থাকতেন।'

ক্রুশ্চভের লেখায়ও জানা যায় যে স্তালিনের মরদেহের পাশে পৌছবার পর বেরিয়া বলেছিলেন, অত্যাচারী স্তালিন মরেছে, মরেছে, মরেছে।

শ্রীমতী সোয়েৎলানা তার আত্মজীবনীতে বলেছেন যে, শেষের পনেরটি

বছর স্তালিন বেরিয়ার ওপর অত্যন্ত রকমে নির্ভর করতেন। বেরিয়ার হাতে ছিল গুপ্ত পুলিশের ভার। বেরিয়ার কারসাজিতে শ্রীমতী সোয়েৎলানার মামা-বাড়ীর কয়েকজন নির্বাসন দণ্ডে দণ্ডিত হন। বেরিয়ার প্রভাবমুক্ত হবার জন্ত সোয়েৎলানার মা নাদিয়া স্তালিনকে অনেকবার অনুরোধ করেন। কিন্তু স্তালিন কারুর কথা শুনতেন না। নানান ধরনের অশান্তির হাত থেকে মুক্তি পাবার জন্তেই নাদিয়া আত্মহত্যা করেন।

শ্রীমতী সোয়েৎলানা আরও বলেছেন যে, শেষের দিকে স্তালিনের টাকা-মাটি, মাটি-টাকার মতন মনে হত। এক রুবল আর এক হাজার রুবলের কোনো তফাৎ ছিল না। স্তালিনকে খুসী করার জন্তেই একদল স্বার্থান্বেষী স্তালিনের ছোট ছেলে ভাশিলিকে ২৪ বছর বয়সে সেনাপতি বানায় এবং তাদের স্বার্থ সিদ্ধির উদ্দেশ্তে ভাশিলিকে দিয়ে যা খুসী তাই করিয়ে নিত।

সমস্ত বইটাতে দেখা যাবে একটি পরিবারের অশান্তিজনক দুঃখের কাহিনী। সোভিয়েত ইউনিয়নের সর্বশক্তিমান পুরুষের কী শোচনীয় পারিবারিক জীবন।

ক্রুশ্চভের মৃত্যু হয়েছে ১৯৭১ সালের অক্টোবরে। এ যাত্রায় অনেককে জিজ্ঞাসা করেছিলেন ক্রুশ্চভ সম্বন্ধে। কাউকে কোনো আগ্রহ প্রকাশ করতে দেখলাম না। পশ্চিমী রাষ্ট্রে ক্রুশ্চেভ যত আলোচিত হত তার এক হাজারের একাংশও আলোচিত হয় না সোভিয়েত ইউনিয়নে। বরং ক্রুশ্চভের প্রশ্ন তোলায় বহু সোভিয়েতবাসী বিরক্ত প্রকাশ করেছেন। অধিকাংশ লোকই বলেছেন, ক্রুশ্চভ ব্যর্থতার পরিচয় দিয়েছিলেন। তিনি খালি বক্‌বক্‌ করতেন। তাই সবাই তার প্রতি বিরক্ত হন। দেখছেন না, কোসিগিন বা ব্রেজনেভ এরা মোটেই বাজে বকেন না। এরা কম কথার মানুষ, কাজের লোক। এই কথাই শুনেছি এবার সোভিয়েত ইউনিয়নে।

অনেকে বললেন, ক্রুশ্চভ মাঝে মাঝে এতই অবাস্তব কথা বলতেন তার তুলনা হয় না, যেমন ধরুন ইলেকট্রিক সম্বন্ধে তার জ্ঞান ছিল না কিন্তু ইলেকট্রনিক এঞ্জিনিয়ারদের তিনি উপদেশ দিয়ে বসতেন। ফলে পণ্ডিত ব্যক্তিরা ক্ষুব্ধ হতেন। ক্ষেত খামার সম্বন্ধেও তিনি উপদেশ দিতেন। এই কারণেই তাঁকে অবসর নিতে হয়েছিল। কৃষি উন্নয়ন সম্পর্কে ক্রুশ্চভের অদ্ভুত মতবাদ ছিল এবং সেগুলো তিনি চালাবার চেষ্টা করতেন। ক্ষমতাচ্যুত হয়ে যখন তিনি একটি গ্রামের বাড়িতে অবসর জীবন যাপন

করছিলেন তখন বেড়াতে বেরুলেই গ্রামের চাষীদের তিনি তার মতবাদ বোঝাতে চেষ্টা করতেন। চাষীরা তাদের কাজে ওসব পছন্দ করত না। চাষীরা উত্তরে বলত—আমাদের কাজে বাগড়া দেবেন না। আমরা যে ভাবে চাষ বাস করছি তেমনি করতে দিন। যা বোঝেন না তাই নিয়ে উপদেশ কেন? অনেক বক্তৃতা হয়েছে এবার চুপ করুন।

বিদেশে মানুষ ক্রুশ্চভকে নিয়ে অনেক আলোচনা করতে শুনেছি। বিদেশে ক্রুশ্চভের জনপ্রিয়তা ছিল মানুষ হিসেবে। ক্রুশ্চভের আমলে শান্তিপূর্ণ সহযোগিতার অধ্যায়ের সূচনা হয়। তার আমলেই ভারতের সঙ্গে সোভিয়েত ইউনিয়নের মৈত্রীর সম্পর্ক গড়ে ওঠে।

ক্রুশ্চভ যদি স্তালিনের মতন চরম ও গরম পথ ধরতেন তাহলে আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে তৃতীয় শক্তি বা নিরপেক্ষ জোটের সাফল্য কখনই সম্ভব হত না। নিরপেক্ষ জোটের মধ্যে ভারত ও মিশরকে অর্থনৈতিক সহযোগিতা দিয়ে তিনি চীনের বিষ নজরে পড়েন। তাছাড়া তিনি গরম ও চরম পথ ধরলে আজ যে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছে তা সম্ভব হত না। বিশ্বে শান্তিপূর্ণ আবহাওয়ার পরিবর্তে যুদ্ধাতঙ্ক সৃষ্টি হত। দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলা যেতে পারে, ১৯৬১ সালে কিউবায় দূরপাল্লার আণবিক ক্ষেপণাস্ত্র বসানোর ব্যাপার নিয়ে বিশ্বযুদ্ধের পরিস্থিতি গড়ে উঠেছিল, সে সময়ে তিনি সুবুদ্ধির পরিচয় না দিলে আজ বিশ্বের চেহারা অন্য রকম হত। চীন তখন যুদ্ধ চেয়েছিল। স্তালিনের আমলে হলে ঘোলা জল লাল হয়ে উঠত। বহু বিতর্কিত ক্রুশ্চভের সাফল্য এখানেই।

মানুষ ক্রুশ্চভের চেহারা নিয়ে আমি পশ্চিম ইউরোপের জনসাধারণকে হাসি ঠাট্টা করতে দেখেছি। কিন্তু তাঁর মানবতা বোধকে সম্মান করতে দেখেছি।

১৯৬০ সালের মার্চ মাসে ক্রুশ্চভ এলেন তার দলবল নিয়ে প্যারিসে। একদিন সকালে রুশ দূতাবাসের পাশের গলি দিয়ে পায়ে হেঁটে গাড়ীতে উঠবেন আমরা সাংবাদিকের দল তাঁকে ছেঁকে ধরেছি। ঠাট্টা তামাসা ও রসিকতা চলছিল, হঠাৎ দেখি এক বৃদ্ধা ভীড় ঠেলে ঢুকতে চেষ্টা করছেন। এদিকে পুলিশ-প্রহরী ব্যস্ত। ক্রুশ্চভ জিজ্ঞাসা করলেন, কি হয়েছে? বৃদ্ধা রুশ ভাষায় তাঁকে বললেন, তাঁর পরিবারের লোকজনদের খবর পান নি বহুকাল। তাঁরা রাশিয়ায় থাকেন। ঠিকানাও জানেন না। ওই বৃদ্ধা জাতে রুশ বহুকাল দেশ ছাড়া

তাঁর আত্মীয়দের খবর চান। ক্রুশ্চভ তাঁর সাঙ্গোপাঙ্গদের বললেন নামধাম টুকে রাখ। খবর পাঠিও। সপ্তাহ দুই পরে সেই বৃদ্ধা তার আত্মীয়দের খবর তো পেলেনই, উপরন্তু তার ভাইএর এক ছেলে-মেয়ে এসে হাজির প্যারিসে। পারিবারিক মিলন ঘটালেন ক্রুশ্চভ।

শুধুমাত্র সোভিয়েত ইউনিয়নের রাজনৈতিক ইতিহাসে ক্রুশ্চভ ব্যতিক্রম নন, বহু বহু রাষ্ট্রের নেতাদের মধ্যেও তিনি ব্যতিক্রম বহু বিষয়ে। সাধারণতঃ কোনো নেতাকে পাকড়াও করা সহজ নয়। সাংবাদিক সাক্ষাৎকারেও বহু কাঠখড় পোড়াতে হয়। মস্কোয় বিদেশী সাংবাদিকরা জানতেন যে, ক্রুশ্চভকে পাকড়াও করার সহজ পথ হল বিভিন্ন সম্বর্ধনা সভা, ককটেল পার্টি বা ডিনার পার্টি। ককটেল বা ডিনার পার্টিতে ক্রুশ্চভকে বিদেশী সাংবাদিকরা সহজে পাকড়াও করতেন। হাতে গেলাস নিয়ে ক্রুশ্চভও সাংবাদিকদের সঙ্গে সহজ সরলভাবে মিশতেন এবং বহু গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে আলোচনা করতেন যা পরে হয়ে যেত 'হেড লাইন' সংবাদ। এমনি এক ককটেল পার্টিতে এক মার্কিন সাংবাদিক বিনা ফ্ল্যাসে রাত্রি বেলায় ঘরের মধ্যে ক্রুশ্চভের ছবি তুলছিল। ক্রুশ্চভ এসে সাংবাদিককে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, বিনা ফ্ল্যাসে এই রাতের অন্ধকারে কি করে ছবি তুলছ? সাংবাদিকটি উত্তরে বলেছিলেন ক্যামেরাটা জাপানী আর ফিল্মটা আমেরিকান। বিনা ফ্ল্যাসে ছবি ওঠে। ক্রুশ্চভ তাঁকে তারিফ করেছিলেন।

আসলে ক্রুশ্চভ ছিলেন শিল্পী। ১৯৬৫ সালে অবসর জীবনযাপনকালে তিনি বাড়ীতে বসে নিজে হাতে ক্যামেরায় ছবি তুলে ডেভেলপ ও প্রিণ্ট করতেন।

নেহেরুর মতন ক্রুশ্চভও ছিলেন সৌখিন ফটোগ্রাফার।

ক্রুশ্চেভের আমলে ১৯৫৬ সালেই ভারতীয় আর্টের ওপর অতি সুন্দর একটি রুশ বই প্রকাশিত হয়েছিল। শোনা যায় ওটা নাকি ক্রুশ্চেভের প্রচেষ্টায় হয়।

সোভিয়েত রাজনীতি হতে ক্রুশ্চভের বিদায় হয়েছে অনেকগুলো কারণে। ১৯৬৫ সালে ক্রুশ্চভহীন সোভিয়েত ইউনিয়নে ভ্রমণকালে আমি বহু রুশদের প্রশ্ন করেছিলাম ক্রুশ্চভ সম্বন্ধে। কিছু সরকারি আমলা আমায় বলেছিলেন যে, একদল গরম ও চরমনেতা ক্রুশ্চভের উদার নীতি পছন্দ করেন না। আরেকদল মনে করেন যে, সোভিয়েত ইউনিয়নে প্রয়োজন আরও নিত্য-

নৈমিত্তিক জিনিষপত্র। যে টাকা বিদেশে দেওয়া হচ্ছে সে টাকায় দেশে জনগণের চাহিদা মেটান যায়। এই অপচয় তাঁরা পছন্দ করেন না।

ক্রুশ্চভকে সরিয়ে কিন্তু তার পরবর্তী নেতারা ক্রুশ্চভের অর্থনৈতিক নীতি বর্জন করেন নি। বাজারে কলকারখানার প্রতিযোগিতা নীতি চলতে থাকে। ফলে কলকারখানায় লাভ লোকসান প্রশ্ন বড় হয়ে দাঁড়ায়। যার ফলে জিনিষের মান উন্নত হয়। সে নীতি এখনও চলছে। তাছাড়া চীনের প্রতি ক্রুশ্চভ নীতি এখনও চলছে।

ক্রুশ্চভকে যতটা সাদা মাটা মনে করা হয় ততটা তিনি ছিলেন না। ১৯৫৫ সালে লণ্ডন ভ্রমণের সময় একটি ভোজসভায় কোনো এক বৃটিশ এম-পি ক্রুশ্চভের ছোট ছেলেকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন তুমি নিশ্চয়ই তোমার বাবার সঙ্গে সবসময় এক মত হও না। অর্থাৎ তিনি প্রকারান্তরে ওর মুখ দিয়ে বলাতে চেয়েছিলেন যে ক্রুশ্চেভর নীতি তার ছেলে পচ্ছন্দ করে না। ক্রুশ্চভ তার ইণ্টারপ্রেটারের কাছ থেকে জেনে নিয়ে তৎক্ষণাৎ বলেছিলেন, দেখুন আমরা এখানে আপনাদের অতিথি, রাজনীতি চর্চা করতে হয় আমার কাছে আসুন আবোল-তাবোল বলে আমার পরিবারে প্রভেদ করতে চেষ্টা করবেন না। তাহলে ফলটা ভাল হবে না।

১৯৬০ সালের মে মাসে প্যারিসে বসেছে শীর্ষ সম্মেলন। সোভিয়েত ইউনিয়নের ওপর মার্কিন গুপ্তচর বিমান ইউ,টি ১ ভূপাতিত হওয়ায় শীর্ষ সম্মেলন ভেঙ্গে গেল। শেষের দিন প্যারিসের 'পালে ছ কাহিও' বাড়ীতে সাংবাদিক সম্মেলনে ক্রুশ্চভ বক্তৃতা করতে উঠে সোজা গালাগালি সুরু করলেন। এমন সব শব্দ তিনি ব্যবহার করেছিলেন যে সেগুলোর অনুবাদ হয় না বা করলেও বলা যায় না। ইণ্টারপ্রেটার মহা ফাঁপরে পড়লেন। আমরা দাঁড়িয়ে শুনছি। ইণ্টারপ্রেটার ইতস্ততঃ করায় ক্রুশ্চভ বলে উঠলেন দেখেছেন ইণ্টারপ্রেটারের কাণ্ডকারখানা ওর পরামর্শে আমাকে চলতে হয়। আমি যা বলছি তার উল্টোপাল্টাও বলছে। এক মিনিট পরে তার পিঠ চাপড়ে বললেন ও চালাক ছেলে ঠিক ম্যানেজ করে নেবে। হ্যাঁরে কি বলিস। সে যাত্রায় ইণ্টারপ্রেটার সব কিছুই ম্যানেজ করেছিলেন। ইণ্টারপ্রেটারকে পরে জিজ্ঞাসা করেছিলাম তাঁর কি ওই অবস্থা প্রায়ই হয়? উত্তরে তিনি শুধু হেসেছিলেন।

১৯৬৩ সালে বর্লিনে প্রাচীর হওয়ার পর পূর্ব বার্লিনে এক বিরাট জন

সমাবেশ ক্রুশ্চভকে প্রায় ছ ঘণ্টা বক্তৃতা করতে দেখেছিলাম। তখন জুন মাস। পশ্চিম বার্লিনে এসেছিলেন প্রেসিডেণ্ট কেনেডি। তারই প্রতি উত্তর দিলেন ক্রুশ্চভ পূর্ব বার্লিনে। ক্রুশ্চভ কথা বলতেন আস্তে। কিন্তু ভাষার জোর সংঘাতিক বক্তৃতার মধ্যে নানা প্রবাদ ও উপমা দিয়ে বলতেন ক্রুশ্চভ।

## ক্রুশ্চভোত্তর রাজনীতি

ক্রুশ্চভোত্তর সোভিয়েত রাজনীতিতে উদারতা আরও প্রসার লাভ করেছে। কোনো একবগ্গা রাজনীতি নিয়ে এঁরা এখন চলছেন না। শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান নীতি শুধু কথার কথা নয়, সোভিয়েত ইউনিয়ন সত্যি সত্যি শান্তি চায় বলেই ইউরোপীয় রাজনীতিতে পরিবর্তন শুরু করে ১৯৬৫ সালে। পশ্চিম ইউরোপের সঙ্গে যে ঠাণ্ডা সম্পর্ক ছিল তার অবসান ঘটে ১৯৬৫ সালে। তার প্রথম ধারা হিসেবে ফ্রান্সের সঙ্গে চুক্তি সম্পাদিত হয় ওই বছরে। তারপর ১৯৭০ সালে হয় পশ্চিম জার্মানীর সঙ্গে। এ শুধু সম্প্রতিকালের সোভিয়েত ইতিহাসে উল্লেখযোগ্য ঘটনা নয়, ইউরোপের ইতিহাসেও। পোদগর্নী, ব্রেজনেভ ও কোসিগিন ত্রয়ের নেতৃত্বে সোভিয়েত দেশের প্রগতি এগিয়ে চলেছে দুর্বার গতিতে।

যে সময়ে এশিয়ার রাজনৈতিক বাজার বেজায় গরম, ভারত-পাক সংঘর্ষ, ইন্দোনেশিয়ায় চীনের বিপর্যয়, ভিয়েৎনামের চিরস্থায়ী যুদ্ধ, আলজেরিয়ায় আফ্রোএশীয় শীর্ষ সম্মেলনে ইত্যাদি গরম খবরে ভারতীয় পাঠক ব্যতিব্যস্ত, ঠিক সে সময়ে পশ্চিম ইউরোপের রাজনৈতিক রঙ্গমঞ্চে দৃশ্য পরিবর্তন ঘটেছে অতি দ্রুত ভাবে। এবং এই ধরনের রাজনৈতিক পটপরিবর্তন সামান্য ঘটনা নয়। পূর্ব ও পঃ ইউরোপের রাজনৈতিক দ্বার উভয় দলের কাছে ছিল রুদ্ধ। মার্কিণ শাসিত পশ্চিম ইউরোপের কোনো রাষ্ট্রের সাথে রুশদের রাজনৈতিক বা গোপন সামরিক চুক্তি আজ পর্যন্ত সম্ভব হয় নি। সে অসম্ভব ঘটনা সম্ভবপর করে তোলেন ফরাসী রাষ্ট্রপতি জেনারেল দ্যগল। রাশিয়ার সাথে ফ্রান্সের বোঝাপড়া হয়েছে এবং ফ্রান্স মারফৎ রাশিয়া সরাসরি পশ্চিম ইউরোপীয় রাজনীতিতে প্রবেশ করেছে।

১৯৬৫ সালের এপ্রিল মাসে প্যারিসে এসেছিলেন রুশ পররাষ্ট্রমন্ত্রী মঁঃ গ্রমিকো। ফরাসী পররাষ্ট্রমন্ত্রী মঁঃ কুভ্ দ্য মুরভিল গেলেন মস্কোয় রাজনৈতিক আলোচনা ও গোপন চুক্তি করতে। রাশিয়ার সাথে ফ্রান্সের এত গলাগলি ভাব পছন্দ করেনি মার্কিনরা। এই নিয়ে মার্কিনরা হৈ চৈ বাধিয়ে দেয়। এ সম্বন্ধে দ্য গল কী ভাবেন তার ইতিবৃত্ত ছাপে 'নিউজ উইক'। নিউজ উইক' সাপ্তাহিকের প্রবন্ধটি প্যারিসে বোমার মতন ফাটে। এই প্রবন্ধের প্রতি-উত্তরে ফরাসী পররাষ্ট্র দপ্তর শেষ পর্যন্ত সরকারী মন্তব্য ছাপতে বাধ্য হয়। দ্য গল বলেছেন, 'সরকারী ভাবে পশ্চিম জার্মানী বর্তমান ফ্রান্সের মিত্র রাষ্ট্র। প্রয়োজন হলে ফ্রান্স জার্মানীকে সাহায্য করবে সামরিক বাহিনী দিয়ে। সুতরাং জার্মানীর কোনো প্রয়োজন নেই অতি আধুনিক সামরিক বাহিনীর। তিনি জার্মানী সম্বন্ধে আরও বলেছেন যে, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের শেষে চতুর্থ শক্তির চুক্তিবলে জার্মানী এখনও এই চারটি রাষ্ট্রের অধীনে এবং তার কোনো সামরিক বাহিনী থাকা উচিত নয়। এবং তাদের সামরিক শক্তি বাড়তে দেওয়া উচিত নয়। মনে রাখতে হবে জার্মানী একটি পরাজিত দেশ এবং এখনও সে সার্বভৌমত্ব ফিরে পায় নি। এর থেকে বোঝা যাবে জার্মানরা কী মনে করে দ্য গল ও ফ্রান্স সম্পর্কে। তিনি জোর গলায় বলেছেন যে, ইউরোপীয় রাজনীতিতে মার্কিনদের খবরদারি তিনি বরদাস্ত করবেন না। যতদিন পর্যন্ত ইউরোপের মাটি হতে মার্কিন চলে না যাচ্ছে ততদিন পর্যন্ত তিনি নিশ্চিন্তে ঘুমোতে পারবেন না। উত্তর অতলান্তিক চুক্তিতে মার্কিনদের খবরদারি চলবে না। চাই সদস্য রাষ্ট্রগুলোর যুক্ত ব্যবস্থাপনা। সর্বশেষে তিনি রাশিয়া সম্বন্ধে বলেছেন যে, রাশিয়ার সাথে তিনি চুক্তি করতে চান। সোভিয়েত ইউনিয়নের ইউরোপীয় অংশও ইউরোপীয়দের জন্যে তিনি যুদ্ধে যেতে প্রস্তুত।

মার্কিনদের তরফ থেকে শোনা গেছে যে, মার্কিন সরকার ফ্রান্সে অবস্থিত তাদের সৈন্য সামন্ত ও সামরিক ছাউনি শিগ্‌গির গুটিয়ে ফেলবে। মার্কিনদের সাথে ফ্রান্সের সম্পর্ক শিথিল হওয়া মানে জার্মানদের সাথেও। কমন মার্কেট নিয়ে জার্মানীর সাথে ফ্রান্সের সম্পর্ক এখন তিক্ত। এবং জার্মানীকে পরোক্ষভাবে শিক্ষা দেওয়ার জন্যেই ফরাসী সরকার পাঠিয়েছে তার পররাস্ট্র মন্ত্রীকে মস্কোয় রুশ বিপ্লবের পরে ১৯৬৫ সাল পর্যন্ত চারজন ফরাসী পররাস্ট্রমন্ত্রী মস্কো সফরে গেছেন সুতরাং মঁঃ কুভ্ দ্য মুরভিলের মস্কো সফর অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কয়েকটি ফরাসী সংবাদপত্র বলেছে যে, আদেনওয়ার যখন জার্মান প্রধানমন্ত্রী

ছিলেন তখন দ্য গল সরকারের সাথে তাদের ভাল সম্পর্ক ছিল। এরহার্ডের সাথে দ্য গলের বনিবনা নেই।

মস্কো আলোচনায় ফরাসী পররাস্ট্র মন্ত্রী শুধু গোপন সামরিক ও রাজনৈতিক চুক্তিই করেন নি। তিনি অর্থনৈতিক চুক্তিও করেন। তার আগে ফরাসী অর্থমন্ত্রী পোল্যাণ্ডে গিয়েছিলেন বাণিজ্য চুক্তি করতে। ফ্রান্সের উদ্বৃত্ত কৃষিজ দ্রব্য এখন রপ্তানী হবে রাশিয়ায়, পোল্যাণ্ডে ও অন্যান্য কম্যুনিষ্ট দেশে। তাহলে ফ্রান্সের বর্তমান আভ্যন্তরীণ বাজারের অবস্থা ভাল হবে। কমন মার্কেটে ফরাসী শিল্পজাত ও কৃষিজাত দ্রব্য বেচার যে সমস্যা দেখা দিয়েছিল, সে সমস্যা এখন সমাধানের পথে।

রাশিয়ার প্রতি দ্য গল সরকারের গোপন চুক্তি ও নতুন রাজনৈতিক সম্পর্ক রচনায় রুশ প্রধানমন্ত্রী কোসিগিন বলেছেন যে, এই দুই বৃহৎ শক্তির মিলনে ইউরোপের প্রতিরক্ষা শক্তি আরও বৃদ্ধি পেল। ফ্রান্স ও রাশিয়ার সামরিক মিলনে সব চেয়ে চিন্তিত হয়েছে পশ্চিম জার্মানী। তবে ঝানু কূটনৈতিক মহল বলেছে যে যতদিন বর্তমান পরিস্থিতি চলবে ততদিন চলবে ফরাসী-রুশ রাজনৈতিক মিলন। ফ্রান্স যদি কোনো দিন আক্রান্ত হয় তাহলে সে তৎক্ষণাৎ আহ্বান করবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে। যেমন সে করেছিল গত দুই মহাযুদ্ধে।

সোভিয়েতদের সম্পর্ক শুধু ফ্রান্সেই ভাল হয়েছে তা নয়। পশ্চিম ইউরোপের বহু দেশ ও জাপানের সঙ্গে তাদের রাজনৈতিক সম্পর্ক ভালতো হয়েছেই বরং তাদের সঙ্গে বাণিজ্যের বহর বেড়েছে। এককালের শত্রু দেশের সঙ্গেও এখন সোভিয়েত ইউনিয়নের সম্পর্ক ভাল হচ্ছে বলেই ব্যবসা-বাণিজ্য বেড়ে চলেছে, পশ্চিম জগৎ এখন আর অস্পৃশ্য নয়। ১৯৭০ সালে যে নবযুগের সূচনা হয়েছে তারই কয়েকটা দৃষ্টান্ত দিচ্ছি।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ শেষ হতেই সোভিয়েত ইউনিয়ন ও সমাজতান্ত্রিক দেশগুলোকে লৌহ যবনিকার অন্তরালের দেশ বলে প্রথম প্রচার কার্য শুরু করে ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী চার্চিল। দিন-কাল এখন বদলেছে। লৌহ-যবনিকার কোনো অর্থই নেই।

সোভিয়েত রাজনৈতিক নীতির অনেক অদল-বদল হয়েছে। বদল হয়েছে তার বাণিজ্যিক নীতি।

পশ্চিম জার্মানীর সঙ্গে সোভিয়েতের সম্পর্ক যা ছিল এখন আর তা নেই।

সম্প্রতি বন-মস্কো অনাক্রমণ চুক্তি তাই প্রমাণ করল। এর ফলে যেমন দুই দেশের মধ্যে নতুন সম্পর্ক গড়ে উঠল তেমনি দুই দেশের মধ্যে বাণিজ্যিক সম্পর্ক আরও প্রশস্ত হল।

রাশিয়ার সঙ্গে জার্মানীর কী সম্পর্ক ছিল তা নতুন করে বলার প্রয়োজন নেই। কিন্তু ফ্রান্সের সঙ্গে রাশিয়ার সম্পর্ক বরাবরই ভাল। তাই রাজনৈতিক ভারসাম্য বজায় রাখতে সোভিয়েত ইউনিয়ন ফ্রান্সের সঙ্গে নতুন বাণিজ্য চুক্তি করেছে। এই চুক্তিতে আছে আণবিক শক্তির ব্যবহার, রঙীন টেলিভিশান, রেনো কোম্পানীর গাড়ী নির্মাণ ইত্যাদি।

সম্প্রতি ফরাসী রাষ্ট্রপতি মঁঃ পম্পিদু যখন মস্কো সফরে গিয়েছিলেন তখন তাঁর সম্মানে একদিনের জন্য মস্কোর বিদ্যালয় ও কয়েকটি সরকারী প্রতিষ্ঠানে ছুটি দেওয়া হয়। পম্পিদুর এই সফর সম্বন্ধে সোভিয়েত প্রধানমন্ত্রী মিঃ কোসিগিন বলেছেন যে, এই দুই রাষ্ট্রের মধ্যে অর্থনৈতিক, বৈজ্ঞানিক ও কারিগরি সহযোগিতা আরও বৃদ্ধি পাবে।

গত পাঁচ বছর ধরে ফ্রান্সের সঙ্গে সোভিয়েত ইউনিয়নের বাণিজ্যিক লেন-দেন বৃদ্ধি পেয়ে আসছে। তার হিসেব দেওয়া চলতে পারে।

(দশ লাখ ফ্রাঁর হিসেবে)

| | ১৯৬৫ | ১৯৬৬ | ১৯৬৭ | ১৯৬৮ | ১৯৬৯ |
|---|---|---|---|---|---|
| সোভিয়েত থেকে আমদানি ফ্রান্সে | ৭২১ | ৮৪৭ | ৯২৩ | ৯০২ | ১.০৬১ |
| ফ্রান্সে রপ্তানি করছে সোভিয়েত ইউনিয়নে | ৩৫৬ | ৩৭৩ | ৭৬৬ | ১.২৬৬ | ১.৩৭২ |

এই বাণিজ্যের মধ্যে ফ্রান্স প্রধানতঃ আমদানি করেছে পেট্রল ও পেট্রলজাত দ্রব্য এবং রপ্তানী করেছে যন্ত্রপাতি ও পোষাক। জার্মানীর সঙ্গে রাশিয়ার যে সম্পর্কই থাকুক না কেন পশ্চিম জার্মানীর সবচেয়ে বড় খদ্দের সোভিয়েত ইউনিয়ন। পশ্চিমের দেশগুলোর মধ্যে আজকাল যত বাণিজ্য হয় সোভিয়েত ইউনিয়নের তার বেশীর ভাগ ফ্রান্সের সঙ্গে হয় বরং পশ্চিম জার্মানীর জাপান ও ব্রিটেনের সঙ্গে। এই সব দেশগুলোর সঙ্গে সোভিয়েত ইউনিয়নের যে আমদানী ও রপ্তানী ১৯৬৭ থেকে ১৯৬৯ পর্যন্ত তিন বছরে চলেছে পর পৃষ্ঠার টেবলে তারহিসেব দেওয়া হলো :—

( দশ লাখ ডলার হিসেবে )

| দেশ | সোভিয়েত থেকে আমদানি | | | সোভিয়েত দেশে রপ্তানী | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | ১৯৬৭ | ১৯৬৮ | ১৯৬৯ | ১৯৬৭ | ১৯৬৮ | ১৯৬৯ |
| ফ্রান্স | ১৮৭ | ১৮২ | ২০৪ | ১৫৫ | ২৫৬ | ২৬৪ |
| জাপান | ৪৫৪ | ৪৬৪ | ৪৬২ | ১৫৮ | ১৭৯ | ২৬৮ |
| পঃ জার্মানী | ২৬৫ | ২৯২ | ৩৩৪ | ১৯৮ | ২১৩ | ৪০৫ |
| ইতালি | ২৭৪ | ২৮৫ | ২৪৭ | ১২৫ | ১৭৯ | ২৮৭ |
| ব্রিটেন | ৩৩৮ | ৩৭৯ | ৪১৩ | ১৭৪ | ২৪৫ | ২৩১ |

জাপান ও ব্রিটেন সোভিয়েত থেকে কাঁচা মাল ও খাদ্য-দ্রব্য আমদানি করে। এদের কারখানা চালাতে সোভিয়েত কাঁচা মাল অপরিহার্য। এর পরেও সোভিয়েত দেশকে আর লৌহ-যবনিকার অন্তরালের দেশ বলা কি উচিত?

## সামরিক শক্তিতে রুশরা মার্কিনীদের টেক্কা দিয়েছে

যাঁরা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রাজনীতি সম্বন্ধে ওয়াকেবহাল তাঁরা বলছেন, প্রেসিডেন্ট নিকসনের সোভিয়েত সফর একেবারে ব্যর্থ হয়নি। শুধু ভিয়েৎনাম প্রশ্ন আলোচনা করবার জন্যে তিনি মস্কো যান নি। প্রধান উদ্দেশ্য ছিল অন্য কিছু।

এ সম্বন্ধে আলোকপাত করেছেন মার্কিণ বিশেষজ্ঞরা। তাঁরা বলেছেন, নিকসন সরকার হঠাৎ আবিষ্কার করেছে নতুন ধরনের আণবিক অস্ত্র-শস্ত্রে ব্যাপারে সোভিয়েতরা মার্কিনদের পেছনে ফেলে অনেকখানি এগিয়ে গেছে। গত চার পাঁচ বছরে মার্কিন সরকার যখন চন্দ্রাভিযানে ব্যস্ত, তখন সোভিয়েতরা ওই ব্যাপারে অর্থব্যয় না করে তারা অস্ত্রাগার বৃদ্ধি করেছে। তাই নিকসন মস্কোয় গিয়ে সোভিয়েত নেতৃবৃন্দের সঙ্গে যে সব চুক্তি করে এসেছেন তাতে অস্ত্র প্রতিযোগিতায় শিথিলতা আসবে এবং মার্কিন সরকার কিছু সময় পাবেন তার নিজের অস্ত্রাগার বৃদ্ধি করতে।

আমেরিকান সিকিউরিটি কাউন্সিলের পত্রিকায় ষ্ট্যানফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের

অধ্যাপক টি. পোশোনী লিখেছেন—১৯৬৮ সাল থেকে চলছে সল্ট অথবা স্ট্রাটেজিক্যাল আর্মস লিমিটেশান টকস্-এর অধিবেশন এবং রাশিয়ানরা সর্বদাই নিস্পৃহের ভাব দেখিয়েছে। মনে হয়েছে, তারা দূরপাল্লার ক্ষেপণাস্ত্র নিয়ে মোটেই মাথা ঘামায় না। এ বিষয়ে তারা আদৌ চিন্তিত নয়। কিন্তু এখন দেখা যাচ্ছে, সোভিয়েতরা এই চার বছরে আই-সি-বি-এম অর্থাৎ আন্তর্মহাদেশীয় আণবিক ক্ষেপণাস্ত্র বিষয়ে মার্কিনদের টেক্কা মেরে দিয়েছে। ১৯৬৮ সালে সুরু হয়েছে আণবিক অস্ত্র কমানোর আলোচনা, ঠিক সে সময়ে সোভিয়েতদের ছিল ছ'শটি আন্তর্মহাদেশীয় আণবিক ক্ষেপণাস্ত্র, আর এখন ১৯৭২ সালে তার সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে হয়েছে পনরশ দশটি। তার মধ্যে আছে কম মারাত্মক রকমের আণবিক অস্ত্র এস—১৩ ষাটটি। এই ক্ষেপণাস্ত্রের মাথায় অনেকগুলো আণবিক বোমা থাকে এবং সেগুলো যে কোনো দিকে ছোঁড়া যেতে পারে। আমেরিকানদেরও রয়েছে এই ধরনের ক্ষেপণাস্ত্র, যার নাম মিনিট-ম্যান গোটা পনের মাত্র। সোভিয়েতদের বহুমুখী ক্ষেপণাস্ত্র এস—১৩ ছোঁড়া হলে তারা যে কোন মুহূর্তে আমেরিকার অস্ত্রাগার ধ্বংস করতে পারবে।

যখন সোভিয়েতদের ক্ষেপণাস্ত্র বৃদ্ধি পেয়েছে ঠিক তখন অর্থাৎ এই চার বছরে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের আই-সি-বি-এম ক্ষেপণাস্ত্রের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে হয়েছে এক হাজার চুয়ান্নটি। অর্থাৎ আণবিক ক্ষেপণাস্ত্রের ব্যাপারে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র আর প্রথম শক্তি নয়। প্রথম শক্তি এখন সোভিয়েত ইউনিয়ন।

১৯৬৮ সালের গোড়ায় সোভিয়েতদের ছিল মাত্র চারটি ওয়াই শ্রেণীর সাবমেরিন এবং যাতে ছিল ষোলটি আই-সি-বি-এম ক্ষেপণাস্ত্র। এই ধরণের ক্ষেপণাস্ত্র ছোঁড়ার সাবমেরিনের সংখ্যা এখন ওদের পঁচিশটি। আণবিক ক্ষেপণাস্ত্র ছোঁড়ার সাবমেরিনের সংখ্যা সোভিয়েতদের এখন পঁচিশটি।

গত চার বছরে আমেরিকানরা আণবিক ক্ষেপণাস্ত্র ধ্বংস করার ক্ষেপণাস্ত্র এ্যান্টি মিসাইল-ছিমাইল অস্ত্র নির্মাণ করতে সক্ষম হয়নি। এখনও তাদের এই অস্ত্র নেই। কিন্তু সোভিয়েতের রয়েছে এ্যান্টি মিসাইল-মিসাইল ছোঁড়ার ছাউনি মস্কো শহরের চার ধারে, গুরুত্বপূর্ণ ঘাঁটিগুলোতে ও বাল্টিক সমুদ্রোপকূলে মিসাইল এ্যান্টি মিসাইল ছোঁড়ার ঘাঁটির সংখ্যা হচ্ছে চৌষট্টিটি। আমেরিকানদের নেই একটিও।

মার্কিন সামরিক বাহিনীর সেনানায়ক কমিটির সভাপতি এ্যাডমিরাল টমাস এইচ. মুরার সম্প্রতি মার্কিন সিনেটের সামরিক কমিটির সভায় বলেছেন,

গুরুত্বপূর্ণ অস্ত্রের প্রতিযোগিতায় আমরা পিছিয়ে পড়েছি। কয়েকটি ক্ষেত্রে রুশরা আমাদের ছাড়িয়ে অনেক এগিয়ে গেছে। আন্তর্মহাদেশীয় ক্ষেপণাস্ত্র ও এ্যাটম বোমার মেগাটন শক্তিতে রুশরা এখন আমাদের চেয়ে একগুণ বেশী শক্তিশালী। অবশ্য ক্ষেপণাস্ত্রের শক্তিতে আমেরিকা একেবারে পিছিয়ে নেই বলে তিনি মন্তব্য করেছেন।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিরক্ষা দপ্তরের রিসার্চ এণ্ড টেকনলজি বিভাগের ডিরেকটর ডঃ জন এস ফস্টার বলেছেন ইদানিং সোভিয়েতরা আনবিক ক্ষেপণাস্ত্রে মার্কিনদের ছাড়িয়ে গেছে। তিনি প্রেসিডেন্ট আইাসেনহাওয়ারের বক্তব্য উদ্ধৃতি করে বলেছেন যে চাঁদে মানুষ অবতরণ ও ভিয়েৎনাম যুদ্ধে তাদের সরকার যে সময় ও অর্থের অপচয় করেছে তার বদলে রুশরা নিজেদের অস্ত্রাগার বৃদ্ধিকল্পে ব্যয়ের মাত্রা বাড়িয়েছে।

ডাঃ ফস্টারের মতে সোভিয়েত ইউনিয়ন ১৯৫৫ সালে সমরাস্ত্র উন্নয়ন কল্পে ব্যয় করত দুই বিলিয়ন ডলার আর এখন তারা বছরে ব্যয় করছে নয় বিলিয়ন ডলার। তিনি আরও বলেছেন যে, ১৯৭২ সালে রুশরা আমেরিকান দের সবমেরিন থেকে ছোঁড়া পোলারিশ ক্ষেপণাস্ত্রের চেয়েও উন্নত ধরনের ক্ষেপণাস্ত্র নির্মাণ করতে সক্ষম হয়েছে, উপরন্তু তারা এমন এক ধরনের ক্ষেপণাস্ত্র নির্মাণ করেছে যা মহাকাশে ওড়া মার্কিন উপগ্রহ ধ্বংস করতে সক্ষম হবে।

রুশরা নতুন ধরনের অস্ত্রশস্ত্র নির্মাণ করেই কিন্তু পুরোনোগুলোর জলাঞ্জলি দেয় না। তারা সেগুলোরও সংস্কার করে এবং সেগুলোর সংখ্যাও বাড়িয়ে থাকে। আনবিক বোমা বর্ষণকারী দূরপাল্লার বোমারু বিমানের সংখ্যা ছিল মার্কিনদের ষোলশ। এখন সেগুলো কমিয়ে করা হয়েছে চারশ। কিন্তু রুশদের এই ধরনের বিমানের সংখ্যা আটশ।

ইউ, এস নিউজ পত্রিকায় বলা হয়েছে যে, সোভিয়েত ইউনিয়নের আয়তন এত বৃহৎ ও তার শহর এবং কারখানা সব ছড়ান। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে তার উল্টো, এক জায়গায় সব কেন্দ্রীভূত। ক্ষেপণাস্ত্রের আক্রমণে মার্কিন যুক্ত-রাষ্ট্রের যত ক্ষতি হবে ঠিক ততখানি হবে না সোভিয়েত ইউনিয়নের।

সোভিয়েত ইউনিয়নের প্রতিপত্তি বেড়েছে সবচেয়ে বেশী তার নৌবহরে। এদিকে মার্কিনরা বহুকাল তাদের অবজ্ঞার চোখে দেখেছে। এখন তাদের চক্ষু চড়কগাছ। এ্যাডমিরাল মুরার জানিয়েছেন যে, ১৯৭১ সালে সোভিয়েত

নৌবহরে ছিল এক হাজার শতরটি ছোট-বড় সব রকমের জাহাজ। সেখানে মার্কিনদের রয়েছে মাত্র ৫৯৮টি।

আরেক মার্কিণ বিশেষজ্ঞ এ্যাডমিরাল রিকোভার জানিয়েছেন, ১৯৭১ সালে রুশদের ছিল ৩৮৫টি সাবমেরিন, তার মধ্যে ৮৩টি আণবিক যন্ত্রে চালিত। আমেরিকানদের রয়েছে ৫৩টি নিউক্লিয়র সাবমেরিন। এগুলো অতি আধুনিক ও বড় সাবমেরিন। কিন্তু ছোটখাট সাবমেরিন রয়েছে রুশদের পাঁচশর মতন। আমেরিকানরা বড় বড় কতকগুলো বোমারু বিমানবাহী জাহাজ নির্মাণ করেছে। যেমন এণ্টারপ্রাইজ ইত্যাদি। এগুলোকে আর রুশরা ভয় করে না। কারণ এই সব জাহাজ ডোবাতে পারে তাদের বড় সাবমেরিনগুলো। রুশদের নৌবহর এখন তিনটি ঘাঁটি স্থাপন করেছে। তারা তিন দলে বিভক্ত। প্রথমটি হচ্ছে উত্তর সাগর ও এ্যাণ্টারটিক অঞ্চলে, দ্বিতীয়টি ভূমধ্যসাগরে ও তৃতীয়টি ভারত মহাসাগরে। ভারত মহাসাগরের একটি ঘাঁটির সহায়তা তারা পাচ্ছে বিশাখাপত্তনম বন্দর থেকে। এই কারণেই ১৯৭১ সালের ডিসেম্বরে ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধে মার্কিণদের রণ-হুঙ্কার ও সপ্তম নৌবহরের আবির্ভাব কার্যকরী হয়নি।

সোভিয়েত ইউনিয়নের সামরিক বাহিনীর মধ্যে ১০২টি ডিভিসন হচ্ছে গোলন্দাজ বাহিনী, ৫১ ডিভিসন ট্যাংকবাহী, ৭ ডিভিসন বিমানবাহী। রুশদের নবনির্মিত ট্যাংকটি—১০এ আছে ইনফ্রা রেড রে, এই দিয়ে তারা রাত্রেও আক্রমণ চালাতে সক্ষম। ১৬০ ডিভিসনের মধ্যে ৬০ ডিভিসন এখন রয়েছে ইউরোপীয় সোভিয়েত অঞ্চলে। ৮ ডিভিশন রয়েছে সাই-বেরিয়ায়, ২৮ ডিভিসন রয়েছে ককেশাশ পর্বতমালায়, ৩৩ ডিভিসন রয়েছে চীন সীমান্তে এবং আর তার মধ্যে ১০ ডিভিশন ট্যাংকবাহী। ৩১ ডিভিসন ট্যাংকবাহী ৩১ ডিভিশন রয়েছে পূর্ব ইউরোপীয় রাষ্ট্রগুলোতে। তার মধ্যে ২০ ডিভিসন রয়েছে পূর্ব জার্মানীতে।

মার্কিনদের পৃষ্ঠপোষকতায় উত্তর অতলান্তিক চুক্তি গোষ্ঠীর পশ্চিম ইউ-রোপে রয়েছে ৬০ ডিভিসন এবং তার মধ্যে রয়েছে ছোটখাট ৭০০ আণবিক ক্ষেপণাস্ত্র। কিন্তু এদের নেই দূরপাল্লার ক্ষেপণাস্ত্র। তাহলেও এদের শক্তি একেবারে নগণ্য নয়।

সোভিয়েত ইউনিয়নের সামরিক শক্তির সর্বাঙ্গীন উৎকর্ষ একদিনে সম্ভব হয়নি। ধাপে ধাপে হয়েছে। এককালে নৌবহরে ব্রিটেন এবং তারপর মার্কিন

যুক্তরাস্ট্রের ছিল একচেটে আধিপত্য। সে যুগ এখন গেছে। ১৯৭০ সালের মধ্যে নৌবহর শক্তিতে সোভিয়েত ইউনিয়ন সর্বশ্রেষ্ঠ শক্তিরূপে চিহ্নিত হয়েছিল। কেমন করে হয়েছে তাই বলছি।

বিশ্বের দুই প্রধান শক্তি, মার্কিন যুক্তরাস্ট্র ও সোভিয়েত ইউনিয়নের মধ্যে সামরিক শক্তির প্রতিযোগিতা চলেছে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের ঠিক পর থেকেই। এই প্রতিযোগিতা থেকেই জন্ম নেয় স্পুৎনিক ক্ষেপণ, মহাকাশ অভিযান ও সর্বশেষে চন্দ্রাভিযান। '৫০ দশকে মহাকাশ অভিযানে সোভিয়েত ইউনিয়ন এগিয়ে ছিল। ১৯৫৭ সালের অক্টোবর মাসে স্পুৎনিক পাঠিয়ে সোভিয়েত ইউনিয়ন সবাইকে তাক লাগিয়ে দেয়। তখন মার্কিন যুক্তরাস্ট্র সোভিয়েত ইউনিয়নের অনেক পেছনে। ১৯৬০ সালে কেনেডি রাস্ট্রপতি হয়েই পরিকল্পনা গ্রহণ করেন মহাকাশ অভিযানের। তারই ফলস্বরূপ মার্কিন যুক্তরাস্ট্র মহাকাশ অভিযান পরিকল্পনায় এগুতে থাকে দ্রুতগতিতে এবং ১৯৬৯ সালে মার্কিন যুক্তরাস্ট্র চাঁদে মানুষ নামাতে সমর্থ হয়।

পাঁচ-দশ বছর আগে মহাকাশ অভিযান কর্মসূচীতে অগ্রদূত ছিল সোভিয়েত ইউনিয়ন। সোভিয়েত ইউনিয়ন এখন তার হাত গুটিয়ে বসে নেই। সোভিয়েত নৌবহর এখন প্রচণ্ড বেগে এগিয়ে চলেছে। রুশ নৌ-বাহিনীর সম্প্রসারণে পশ্চিম ইউরোপের সামরিক বিশেষজ্ঞরা বিস্ময় ও উৎকণ্ঠা প্রকাশ করেছেন। নৌবহর ও বাহিনীতে এক কালে প্রাধান্য ছিল ব্রিটিশ ও মার্কিনদের। এখন যে হারে সোভিয়েত নৌবাহিনী এগিয়ে চলেছে, এই হারে এগুলে দু-এক বছরের মধ্যে সে মার্কিনদের ওপর টেক্কা দেবে বলে জানিয়েছে ফরাসী সামরিক বিশেষজ্ঞ সেনাপতি বোফ্র্।

বর্তমানে সোভিয়েত নৌবহরে রয়েছে চারশ' সাবমেরিন, তার মধ্যে একশটিতে আণবিক অস্ত্র-ক্ষেপণের সাজ-সরঞ্জাম এবং চল্লিশটি সাবমেরিন আণবিক শক্তি পরিচালিত। বিশেষজ্ঞরা বলেছেন, ১৯৭১ সালের মধ্যে মার্কিণ যুক্তরাস্ট্রের দ্বিগুণ এ্যাটমিক সাবমেরিন ও এ্যাটমিক ক্ষেপণাস্ত্র ছোঁড়ার সাবমেরিন নির্মাণ করতে সক্ষম হবে সোভিয়েত ইউনিয়ন।

সাগর ও মহাসাগরে সোভিয়েত ইউনিয়নের নৌবহরের হিসেব নিম্নরূপ —হেলিকপ্টারবাহী ছোটো-বড় জাহাজ ২০টির বেশী ক্রুজার, ১০০টির ওপর ডেস্ট্রয়র ও ফ্রিগেট, ৯২টি বড় এস্কর্টার্স, ১৫০টি রণপোত—এই রণপোতে রয়েছে এ্যাটমিক অস্ত্র ক্ষেপণের সাজ-সরঞ্জাম। ৪০০টি পেট্রল বোট, ২৭০টি

ছোট এস্কর্টার্স, ২৫০টি উভচর নৌকা ও মাইন ধরার জাহাজ। প্রশান্ত মহাসাগরে সোভিয়েত নৌবহরের রয়েছে ৪ থেকে ৬টা ক্রুজার, ৩০টি ডেস্ট্রয়ার, ফ্রিগেট ও এস্কর্টাস—সব শুদ্ধ ৭৫০টি জাহাজ।

উত্তরের শ্বেত সমুদ্রে রয়েছে সোভিয়েত ইউনিয়নের ৩টি ক্রুজার ও ৩৫টি ডেস্ট্রয়ার, তাছাড়া নানান ধরনের রণপোত। সব শুদ্ধ তার সংখ্যা ৮০০টি। বালটিক সমুদ্রে নিযুক্ত আছে ৪টিরও বেশী ক্রুজার, ২৫টি ডেস্ট্রয়ার—মোট জাহাজের সংখ্যা ৭৫০টি। কৃষ্ণসাগরে ৭টি ক্রুজার, ৫০টি ডেস্ট্রয়ার ও ফ্রিগেট —মোট জাহাজ ৭০০টি।

সোভিয়েত নৌবহরের বালটিক ও কৃষ্ণসাগরের রণপোতগুলো প্রায়ই টহল দিয়ে বেড়ায় ভূমধ্যসাগরের এবং প্রশান্ত মহাসাগরের রণপোতগুলো নিয়মিত-ভাবে টহল দেয় ভারত মহাসাগরে।

সোভিয়েত বাণিজ্য পোতের অগ্রগতি আরও বিস্ময়কর। ১৯৫০ সালে সোভিয়েত বাণিজ্য পোতের সংখ্যা ছিল ৪৫২টি এবং বর্তমানে সে সংখ্যা ১৪৪২টি। এইভাবে সোভিয়েত বাণিজ্য পোতের সংখ্যা এগুতে থাকলে ১৯৭০ সালের শেষে তার সংখ্যা হবে ২৬০০ এবং ১৯৮০ সালে হবে ৪৩০০টি।

মাছ ধরার নৌকা ও জাহাজ বাহিনীতে সোভিয়েত ইউনিয়ন এখন সবার আগে এগিয়ে রয়েছে; তার মাছ ধরার জাহাজ সংখ্যা ৪০০০টি। এখন বিশ্বে তার স্থান প্রথম, তার পরেই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র।

পশ্চিম ইউরোপের সামরিক বিশেষজ্ঞরা সোভিয়েত ইউনিয়নের নৌবহরের শক্তি বৃদ্ধিতেই শুধু চিন্তিত নয় তার রণপোতের নিয়মিতভাবে ভূমধ্যসাগরে প্রশান্ত মহাসাগরে টহলের জন্য তাঁরা আরও বেশী উৎকণ্ঠা প্রকাশ করেছেন।

## ভূমধ্য সাগরে রুশ-মার্কিন সামরিক রেষারেষি

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ যখন চলছিল, তখন ইউরোপের প্রতিটি দেশের জনগণের মনের কথা ছিল আর যুদ্ধ নয়, চাই শান্তি। কারণ দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে সবচেয়ে বেশী ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিলেন ইউরোপের জনগণ। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ শেষ হল ১৯৪৫ সালে। যুদ্ধাতঙ্ক তখনও ইউরোপের মুখেচোখে। দু' বছর যেতে না যেতেই যুদ্ধের উস্কানি শুরু হয়ে গেল। সোভিয়েত ইউনিয়ন ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে রেষারেষির ফলে জন্ম হল নেটো বা উত্তর অতলান্তিক চুক্তির সামরিক চক্র, যার কর্ণধার হল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র।

পঞ্চাশ ও ষাট দশকের মধ্যকাল পর্যন্ত ইউরোপে ছিল যুদ্ধের উত্তেজনা। কিন্তু ঐ পর্যন্তই। তার বেশী এগোয়নি। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে ইউরোপবাসী হাড়ে-হাড়ে বুঝেছে যুদ্ধ কাকে বলে।

যুদ্ধ নামক নাটকের অভিনয় শুরু হয়ে যায় এশিয়ায় ১৯৪৫-এর পর থেকেই। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের বিস্তৃতি এশিয়ায় চলেছে গত পঁচিশ বছর এবং কবে শেষ হবে তাও কেউ জানে না। ভিয়েতনামকে নিয়ে এশিয়ার যুদ্ধ শুরু হয়েছে ১৯৪৫ সালে, তার জের এখনও চলছে।

মধ্যপ্রাচ্যে ইস্রায়েল ও আরব রাষ্ট্রগুলোর লড়াই শুরু হয় পঁচিশ বছর আগে তার জের এখনও চলছে। ১৯৫৬ সালে সুয়েজ আক্রমণ থেকে আরম্ভ করে ১৯৬৭ সালে ইস্রায়েল আরব লড়াই ভূমধ্য সাগরের গুরুত্ব বাড়িয়ে দিয়েছে। উত্তর অতলান্তিক সামরিক চুক্তি গোষ্ঠীর দৃষ্টি এখন ভূমধ্যসাগরে নিবদ্ধ, অতলান্তিক সাগরে নয়। তাছাড়া গত পনের বছরে ভূমধ্য সাগরের তীরে উত্তর আফ্রিকার সব কটি দেশ পরাধীনতার নাগপাশ ছিন্ন করে স্বাধীন রাষ্ট্রে পরিণত হয়েছে। ভূমধ্য সাগরের তীরে মধ্যপ্রাচ্য দেশগুলোতে আগে খবরদারি করত ব্রিটেন ও ফ্রান্স। তাদের ছিল পরাক্রান্ত নৌবহর। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে তাদের গুরুত্ব কমে গেছে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর ১৯৪৭ সালে ট্রুম্যানের ফতোয়া অনুযায়ী মার্কিন নৌবহরের প্রবেশ ঘটে ভূমধ্য সাগরে। সেই থেকে পরাক্রান্ত মার্কিন নৌবহরের ষষ্ঠ রণতরী ভূমধ্য সাগরে বিরাজ করছে। তাদের দাপটে সবাই ছিল তটস্থ। ১৯৬৭ সালের

ইস্রায়েল-আরব লড়াই-এ ভূমধ্য সাগরে ভারসাম্য বজায় রাখতে এগিয়ে এগিয়ে এলো সোভিয়েত ইউনিয়ন তার নৌবহর নিয়ে। শুরু হলে গেল সামরিক রেষারেষি।

ভূমধ্য সাগর জিব্রাল্টার মাল্টা, সাইপ্রাস, গ্রীস ও তুর্কিতে ব্রিটেনের ছিল নৌবহর। তার জায়গায় প্রবেশ করে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ১৯৪৭ সালের পর। ইস্রায়েল গোড়া থেকেই মার্কিন পৃষ্ঠপোষকতায় লালিত সুতরাং সেখানে মার্কিন নৌবহর থাকবেই। নেটো সামরিক চুক্তির বলে ফ্রান্স, ইতালি ও পর্তুগালে মার্কিন নৌ-ঘাঁটি স্থাপিত হয় ভূমধ্য সাগরে। স্পেনেও অনুরূপ ঘাঁটি।

নৌবহরের ভারসাম্য বজায় রাখতে সোভিয়েত ইউনিয়ন তাঁর ঘাঁটি বানায় ষাট শতকের মধ্যভাগে মিশরের আলেকজান্দ্রিয়া, পোর্ট সঈদ, মার্সা, মাত্রু ও সালাম-এ, সিরিয়ার লতাকিয়া বন্দরে, আলজেরিয়ায় লা কাল এবং মার্স এল কবির বন্দরে। তাছাড়া সোভিয়েতদের রয়েছে মিশর, সিরিয়া ও ইরাকে কয়েকটি বিমানঘাঁটিতে বিশেষ সুযোগ সুবিধা। পশ্চিম ভূমধ্য সাগরে সোভিয়েত নৌবহরের প্রাধান্য থাকলেও সমগ্র ভূমধ্য সাগরে মার্কিণদের রণতরী ও তার সহযোগী দেশগুলোর নৌবহর মিলিয়ে সোভিয়েতদের তুলনায় বেশী শক্তিশালী।

১৯৬৭ সালের ইস্রায়েল-আরব যুদ্ধের পরও ভূমধ্য সাগরে নিয়মিতভাবে পঞ্চাশটি সোভিয়েত রণতরী টহল দিয়ে বেড়িয়েছে। মার্কিনদের মতে ১৯৭১ সালের জানুয়ারী মাস পর্যন্ত ভূমধ্য সাগরে সোভিয়েতদের তেতাল্লিশটি বড় রণতরী, ত্রিশটি মাঝারি ধরনের রণতরী এবং পনেরটি সাবমেরিনকে দেখা গেছে। ইতিমধ্যে তারা সাবমেরিনের সংখ্যা আরও বাড়িয়েছে। ভূমধ্য সাগরে মার্কিনদের প্রাধান্য হল বিমানবাহী রণতরী।

ভূমধ্য সাগরের তীরে মধ্যপ্রাচ্য ও উত্তর আফ্রিকার কয়েকটি দেশে সোভিয়েত নৌবহরের প্রাধান্য বাড়ছে বলে ভূমধ্য সাগরের তীরে ইউরোপীয় দেশগুলোতে সোভিয়েত ভয় বেড়েছে তার ফলে মার্কিনদের প্রভাব বাড়ছে ওই সব দেশে। একমাত্র ব্যতিক্রম দেখা দিয়েছে ফ্রান্সে। ভূমধ্য সাগরে সোভিয়েত ও মার্কিণ রেষারেষিতে এবং ইস্রায়েল-আরব সংঘর্ষে একমাত্র ইউরোপীয় দেশ ফ্রান্স নিরপেক্ষ নীতি গ্রহণ করেছে। ইতালি, গ্রীস, তুর্কী কট্টর মার্কিনপন্থী। তার সঙ্গে রয়েছে ব্রিটেন ও

জার্মানী। ভূমধ্য সাগরে রুশ-মার্কিন সামরিক রেষারেষি যত বেড়েছে তার চার গুণ রেষারেষি বেড়েছে রাজনীতি ও অর্থনীতিতে। দুই দলই চাইছে মধ্যপ্রাচ্যে ও উত্তর আফ্রিকার রাজনৈতিক প্রভাব বাড়াতে। যাট দশকের মধ্যভাগ থেকে এবং ১৯৬৭ সালের সুয়েজ খাল বন্ধ হওয়ায় ভূমধ্য সাগরে অবস্থিত রাষ্ট্রগুলোতে সোভিয়েতদের বানিজ্যিক বহর বেড়েছে দশগুণ। এক-কালে সেখানে শুধু ব্রিটেন, ফ্রান্স ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ছিল একচেটিয়া রাজত্ব। মধ্যপ্রাচ্যের পেট্রল ব্যবসায়ে খবরদারি করত মার্কিনযুক্তরাস্ট্র, ব্রিটেন ও ফ্রান্স। সেখানে তাদের ক্ষমতা হ্রাস করিয়ে সোভিয়েত-এর প্রভাব অনেক বেড়েছে। সুয়েজ খাল বন্ধ হওয়ার উত্তর আফ্রিকার বাণিজ্যে ভূমধ্য সাগরের গুরুত্ব আরও বেড়েছে। প্রত্যেক দিন প্রায় আড়াই হাজার জাহাজ চলাচল করে ভূমধ্য সাগরে। তার অর্ধেক হচ্ছে মার্কিন গোষ্ঠীর। বছরে ১৬০ মিলিয়ন টন জিনিষপত্রের আনাগোনা হয় এই পথে। কমন মার্কেটের খাতিরে প্রাক্তন উপনিবেশ চলেছে তাদের বাণিজ্যের বহর। সেখানে এখন সবচেয়ে বড় প্রতিযোগী রাস্ট্র সোভিয়েত ইউনিয়ন। ভূমধ্য সাগরের তীরে বন্দরগুলো মারফৎ আরব জগতে বছরে রপ্তানী করে মার্কিন যুক্তরাস্ট্র ২০০০ মিলিয়ন ডলারের মাল, তারপরে স্থান হচ্ছে ব্রিটেন, ফ্রান্স, জার্মাণী। এরা বছরে হাজার মিলিয়ন ডলারের মাল বেচে। তার পরেই হল সোভিয়েত ইউনিয়নের স্থান। আগে ছিল ইতালি ও জাপানের প্রাধান্য। এখন তাদের হটিয়ে দিয়ে সোভিয়েত ইউনিয়ন বাণিজ্য প্রতিযোগিতায় এগিয়ে চলেছে কমন মার্কেট, মার্কিন যুক্তরাস্ট্র ও সোভিয়েত ইউনিয়ন ও তার সমাজতান্ত্রিক দেশগুলোকে নিয়ে।

## সোভিয়েত ইউনিয়নের পঞ্চাশ বছর

রুশ বিপ্লবের পঞ্চাশতম বার্ষিকী উদযাপিত হয়েছে ১৯৬৭ সালে। সে বছর আমি সোভিয়েত ইউনের বিভিন্ন অঙ্গরাস্ট্রে দেখেছি বিপুল উদ্দীপনার মধ্যে রুশ বিপ্লবের উৎসব পালন করতে। যে শহরেই গেছে সেখানকার রাস্তা-ঘাটে দেখেছি রঙ বেরঙের পতাকা। উৎসব সাজে সেজেছিল সমস্ত সোভিয়েত

ইউনিয়ন। আবার পাঁচ বছর পর সালে দেখলাম সোভিয়েত ইউনিয়নের পঞ্চাশতম বার্ষিকী পালন। উৎসব মুখর প্রতিটি অঙ্গরাষ্ট্র। সোভিয়েতের মধ্যে এশিয়ায় যেমন উৎসাহ-উদ্দীপনা তেমনি উদ্দীপনা দেখলাম একেবারে উত্তরের বাল্টিক সমুদ্রের তীরবর্তী রাষ্ট্রগুলোতে। সমস্ত সোভিয়েত ইউনিয়ন উৎসবে মেতে গেছে। এস্তোনিয়ার রাজধানী তালিনে গেছি, সেখানে দেখি রাস্তার ধারে বড় বড় করে লেখা সোভিয়েত ইউনিয়নের পঞ্চাশ বছর পূর্তি উপলক্ষে আমরা বিশ্বের শান্তি কামনা করি। রিগা এবং ভিলনিভস যেখানেই গেছে সেখানেই উৎসবের আবহাওয়া দেখেছি। তাশখন্দেও সেই একই আবহাওয়া। মস্কোর তো কথাই নেই।

আমি অনেক দেশের অনেক উৎসব দেখেছি কিন্তু এমন অদ্ভুত উৎসব দেখিনি। এ উৎসব একটি রাস্ট্রের বা একটি দেশের নয়। অনেকগুলো রাস্ট্র মিলিত হয়ে যে ইউনিয়ন গড়ে তুলেছে তারই আনন্দোৎসব। এই ইউনিয়ন দু'চার বা পাঁচ দশ বছরের নয় পঞ্চাশ বছরের। রুশ বিপ্লবের পর যখন সমাজতান্ত্রিক সরকার প্রতিষ্ঠিত হল রাশিয়ায় তখন পশ্চিমের সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলো বলেছিল ওদের বিপ্লবী সরকার বেশী দিন টি কবে না। রাশিয়ার সমাজতান্ত্রিক সরকার কায়েম হওয়ার পাঁচ বছর পর যখন সোভিয়েত ইউনিয়ন গঠিত হল তখনও অনেকে সন্দেহ প্রকাশ করে বলেছিল এই ইউনিয়ন টিঁকবে না। দেখতে দেখতে পঞ্চাশ বছর পার করে দিল সোভিয়েত ইউনিয়ন। সোভিয়েত রাশিয়ার সঙ্গে ইউনিয়নের নামের ব্যবহারে অনেকেই গোলমাল করে ফেলেন। সোভিয়েত রাশিয়া এবং সোভিয়েত ইউনিয়ন এক জিনিষ নয়। সোভিয়েত ইউনিয়নের প্রতিটি সদস্য রাষ্ট্র এক একটি সোভিয়েত। যেমন সোভিয়েত রাশিয়া, সোভিয়েত কাজাকস্থান ইত্যাদি এদের নিয়ে সোভিয়েত ইউনিয়ন। সোভিয়েত ইউনিয়নের পঞ্চাশতম বার্ষিকী উৎসব ঐক্য ও সংহতির উৎসব।

সোভিয়েত ইউনিয়ন এখন একটি সার্থক রাষ্ট্র সংস্থা। কিন্তু গোড়ার দিকে তাকে অনেক প্রতিকূল বাধার মধ্যে দিয়ে চলতে হয়েছে। প্রথম দিকে মধ্য এশিয়ার অশিক্ষিতের দল রুশ ও সে দেশের বিপ্লবী নেতৃবৃন্দের কথায় সন্দেহ প্রকাশ করত। ওই সব দেশ তখন অ-শিক্ষা ও অজ্ঞানতার অন্ধকারে আচ্ছন্ন। প্রবল বাধা ও আপত্তি আসতে থাকে তাদের কাছ থেকে। বিপ্লবী নেতারা অনগ্রসর রাষ্ট্রে শিক্ষার বিস্তার করে সমান সুযোগ সুবিধা দিয়ে,

চিকিৎসার সুবন্দোবস্ত করে যখন দেশে সমৃদ্ধি বাড়িয়ে ছিল তখন যারা বাধা দিয়েছিল সেই তারাই বলতে লাগল রুশ ভাইয়েরা তোমরা চলে যেও না। তোমাদের কাছে আমরা ঋণী। একালের তরুণ সম্প্রদায়ের মধ্যে আমি যা উৎসাহ উদ্দীপনা দেখেছি তা সংহতির জয় ছাড়া কিছু নয়। সোভিয়েত ইউনিয়নের প্রতিটি সদস্য রাষ্ট্রই এখন সোভিয়েত ইউনিয়নের জয় যাত্রায় গর্বিত।

ইউনিয়ন অব দি সোভিয়েত সোসালিস্ট রিপাবলিক অর্থাৎ ইউনিয়নের জন্ম হয় পঞ্চাশ বছর আগে ১৯২২ সালের ৩০শে ডিসেম্বর, মহানায়ক লেনিনের নেতৃত্বে। সোভিয়েত ইউনিয়নের প্রথম কংগ্রেস বসে ওই সময়ে মস্কো নগরীতে। সোভিয়েত ইউনিয়নের সদস্য পনরটি রাস্ট্র যেমন রাশিয়ান ফেডারেশান, ইউক্রেনিয়া, বেলোরাশিয়া, উজবেক, কাজাখ, জর্জিয়া, আজারবাইজান, লিথুনিয়া, মোলদাভিয়া, ল্যাঠভিয়া, কিরঘিজ, তাজিক, আর্মেনিয়া, তুর্কমেনিয়া এবং এস্তোনিয়া। এদের মধ্যে মোলদাভিয়া, লিথুনিয়া, ল্যাটভিয়া এবং এস্তোনিয়া যোগদান করে ১৯৪০ সালে। বাকি রাস্ট্রগুলো ১৯২২ থেকে ১৯৩০ এর মধ্যে যোগ দেয়। প্রত্যেকটি রিপাবলিক হচ্ছে সার্বভৌম রাস্ট্র। প্রত্যেকের রয়েছে নিজস্ব বিধান সভা, সুপ্রীম সোভিয়েত অথবা লোকসভা। প্রত্যেক রিপাবলিকের রয়েছে নিজস্ব আইন। প্রত্যেকটি রিপাবলিক বিদেশের সঙ্গে যোগাযোগ রাখতে সক্ষম এবং ইচ্ছে করলে সোভিয়েত ইউনিয়ন থেকে বেরিয়ে যেতে পারে। প্রত্যেকটি রিপাবলিকের বিধান সভায় ভোট দিতে পারে আঠার বছর পেরুলে যে কেউ রিপাবলিকের লোকসভায় ভোট দেবার এবং সদস্য পদের প্রার্থীর ন্যূনতম বয়স হওয়া চাই একুশ। সোভিয়েত ইউনিয়নের সর্ব্বোচ্চ লোকসভায় ভোট দেবার ও প্রার্থীর ন্যূনতম বয়স হচ্ছে তেইশ বছর।

সোভিয়েত ইউনিয়নের সর্বোচ্চ লোকসভা হচ্ছে দুটো, ইউনিয়নের লোকসভা, জাতি সমূহের লোকসভা। ইউনিয়নের লোকসভায় তিনলাখ লোকের প্রতিনিধি নির্বাচিত হয়ে আসেন একজন করে সদস্য। জাতিসমূহের লোকসভায় আসেন বিভিন্ন রিপাবলিক ও জাতি সমূহের নাগরিকদের নির্বাচিত প্রতিনিধিরা। আর আসেন বিভিন্ন স্বায়ত্বশাসিত প্রদেশ আঞ্চলিক জাতি থেকে প্রতিনিধিরা। এইভাবে এরা আসেন। যেমন প্রতিটি রিপাবলিক থেকে বত্রিশজন করে লোক সভার সদস্য, এগার জন করে প্রতিটি স্বায়ত্ব-শাসিত রিপাবলিক থেকে, পাঁচজন প্রতিনিধি স্বায়ত্বশাসিত প্রদেশ থেকে এবং

একজন করে প্রতিনিধি প্রতিটি জাতির জেলা থেকে। আইন প্রণয়ন করতে হলে দুই সর্বোচ্চ লোক সভার প্রস্তাব গৃহীত হওয়া চাই। সরকার ও মন্ত্রীসভা গঠন করে প্রত্যেকটি রিপাবলিকের সর্বোচ্চ লোকসভা। সোভিয়েত ইউনিয়নের কেন্দ্রীয় সরকার ও মন্ত্রীসভা গঠন করে সোভিয়েত ইউনিয়নের সর্বোচ্চ লোকসভা। এই লোক সভা নির্বাচন করে তাদের যৌথ সভাপতি। সর্বোচ্চ লোকসভা যখন বন্ধ থাকে তখন প্রিসাইডিয়াম অব সুপ্রীম সোভিয়েত নির্দেশ দেয় সরকারকে।

সোভিয়েত ইউনিয়নে রাজনৈতিক দল একটিই এবং সেটি হচ্ছে কম্যুনিষ্ট পার্টি। দেশের সব চেয়ে ক্ষমতাশালী হচ্ছে দলের সেণ্ট্রাল কমিটি। এই সেণ্ট্রাল কমিটি অনেক হ্যাঁ কে না করতে পারে আবার অনেক না কে হ্যাঁ করাতে পারে। সেণ্টাল কমিটির সদস্য শুধু রাজনৈতিক নেতারাই নন, অনেক শ্রমিক, শিল্পী ও বৈজ্ঞানিকও আছেন।

সোভিয়েত ইউনিয়নের যেখানেই গেছি সেখানে কোনো সমস্যা বা গণ্ডগোলের সৃষ্টি হলেই সেণ্ট্রাল কমিটির কথা বলতে শুনেছি। সেণ্ট্রাল কমিটিকে সবাই ভয় করে চলেন তাও শুনেছি। সমস্যার সমাধান তাঁরাই করেন তাও দেখেছি। অধিকাংশ মন্ত্রীই সেণ্ট্রাল কমিটির সদস্য, প্রথম শ্রেণীর রাষ্ট্রদূতরাও ওই কমিটির সদস্য এমনকি বহু বৈজ্ঞানিক আক্যাডেমি এবং সর্ব বৃহৎ কারখানার কিছু পরিচালকও।

পঞ্চাশ বছরে সোভিয়েত ইউনিয়নের সদস্য রাষ্ট্রগুলো সমৃদ্ধির পথে অগ্রসর হয়েছে অনেকখানি। সোভিয়েত ইউনিয়নের সামগ্রিক কৃষি উৎপাদন বেড়েছে পঞ্চাশ বছরে তিনগুণ, একক রাষ্ট্র হিসেবে তাজিকিস্তানের বেড়েছে সাড়ে সাতগুণ, কাজাকস্তানের সাড়ে ছ গুণ, জর্জিয়ার সাড়ে ছ গুণ, কিরঘিজিয়ার সাড়ে পাঁচ গুণ এবং মোলদাভিয়ার পাঁচ গুণ।

সমগ্র সোভিয়েত ইউনিয়নের মোট বিদ্যুৎ উৎপানে রাশিয়ান ফেডারেশন বিদ্যুৎ উৎপন্ন করে শতকরা চৌষট্টি ভাগ, তেমনি পেট্রল উৎপাদনে রাশিয়া করে শতকরা একাশি ভাগ, গ্যাস উৎপাদনে ৪৫%, কয়লা উৎপাদনে ৫৫%, লৌহ উৎপাদনে ৪৯% এবং ইস্পাত উৎপাদনে ৫৪%।

সোভিয়েত ইউনিয়নের মোট উৎপাদনে ইউক্রেনিয়ার অবদান ৩৩%, গ্যাস উৎপাদনে ৩১%, লৌহ উৎপাদনে ৪৮%, লৌহ ও ইস্পাতের পাত উৎপাদনের ৪২%, আকরিক লোহের ৫৬%, ইস্পাত ও লৌহ কারখানা নির্মাণের যন্ত্রপাতি

৪৮%, ডিজেল রেল ইঞ্জিন নির্মাণের ২৪%, ট্র্যাক্টর নির্মানে ৩২%, চিনি উৎপাদনের ৫৮% এবং শস্যের ১৩%।

পঞ্চাশ বছর পর সোভিয়েত ইউনিয়নের ইতিহাসে দেখা যাচ্ছে যা কেবল মাত্র একটি বা দুটি অঙ্গরাস্ট্রেই শিল্পোন্নতি হয়নি, এক কালের অনগ্রসর রাস্ট্রেও হয়েছে প্রভূত পরিমাণে উন্নতি। তার হিসেব খতিয়ে দেখলেই চিত্রটি পরিষ্কার হয়ে যাবে। রাশিয়ার কথা স্বতন্ত্র। কারণ বিপ্লবের বহু আগে সেখানে কলকারখানা যন্ত্র শিল্প ছিল পুঁজিপতিদের তত্ত্বাবধানে। পুঁজিপতিদের প্রচেষ্টায় সেখানেও যন্ত্র শিল্প গড়ে উঠেছিল। কিন্তু এশিয় অঞ্চলের রাজ্যগুলোতে সাইবেরিয়ায় কোনো যন্ত্র শিল্পই ছিল না। এমন কি বেলোরাশিয়া ও ইউক্রেনিয়াও অনেক পিছিয়ে পড়েছিল। তবে ব্যতিক্রম ছিল বাল্টিক সমুদ্রের তীরে লিথুনিয়া, ল্যাটভিয়া ও এস্তোনিয়ায়ে। ওই তিনটি ক্ষুদ্র রাস্ট্রের অর্থনৈতিক অবস্থা খুব খারাপ ছিল না। কিছু কিছু যন্ত্র-শিল্প সেখানেও ছিল। তবে এখনকার মতন নয়। তাছাড়া এই তিনটি রাস্ট্র সোভিয়েত ইউনিয়নে যোগদান করেছে মাত্র ১৯৪০ সালে।

সমগ্র সোভিয়েত ইউনিয়নের মোট উৎপাদনের পরিপ্রেক্ষিতে ১৯৭০ সালে বেলোরাশিয়া পটাশ উৎপাদন করেছে ৪৯%, পলিথেলিন ১৯%, নাইলন কাপড় ১০% ট্রাক্টর ১৮%, ধাতব জিনিষ কাটার মেশিন ১৩%, এবং মোটর সাইকেল ২২%।

১৯২৬ সালে সোভিয়েত ইউনিয়নের মোট উৎপাদনের মাত্র ৭% উৎপাদন হত কাজাকস্তানে। ১৯৬৭ সালের শেষে মধ্য এশিয়ার রিপাবলিকগুলো এবং কাজাকস্তানের উৎপাদন বাড়ে ৭৯% এবং বেলোরাশিয়ার হয় ১০০%।

সোভিয়েত ইউনিয়নের বহু কারখানায় দেখা যাবে বিভিন্ন জাতির শ্রমিকদের মেলা। কোনো একটি রাস্ট্রের কারখানায় শুধু সেই রাস্ট্রের শ্রমিকরাই কাজ করে না, ভিন্ন রাস্ট্র থেকে আসে বহু শ্রমিক। যেমন ধরুন তেমিরতাভ ইস্পাত কারখানায় ৪৬টি বিভিন্ন জাতির শ্রমিকদের ভীড়, ভলগা মোটের কারখানায় কাজ করে ৪৪টি বিভিন্ন জাতির শ্রমিক, নুরেফ জলবিদ্যুৎ কারখানায় রয়েছে ৪১টি জাতির শ্রমিক, উস্ত-কামানো গোরর্স্ক টাইটেনিয়ায় ম্যাগনেসিয়াম কারখানায় ৩২টি জাতির শ্রমিক।

কলকাতা এবং পশ্চিমবঙ্গে বিদ্যুতের অভাবে কারখানার কাজ বন্ধ হবার জোগাড় হয়েছে। চাহিদা বেড়েছে কিন্তু বিদ্যুৎ সরবরাহ নেই। ১৮৭২

সালে সোভিয়েত ইউনিয়নের পঞ্চাশ বর্ষ পূর্তির বছরে মোট বিদ্যুৎ উৎপাদিত হচ্ছে ৮৫০,০০০ মিলিয়ন কিলোওয়াট হাওয়ার। অর্থাৎ ভারতের মোট বিদ্যুৎ উৎপাদনের কয়েকশ গুণ বেশী। ১৯২২ সালের তুলনায় ১,০৬০ মিলিয়ন কিলোওয়াট হাওয়ার গুণ বেশী। এবছরে পেট্রল উত্তোলিত হচ্ছে ৩৯৫ মিলিয়ন টন, ১৯২২ সালের তুলনায় ৮৪ গুণ বেশী।

ভারতে এখন ইস্পাত তৈরী হয় পাঁচ-ছয় মিলিয়ন টন বছরে। আর এ বছরে সোভিয়েত ইউনিয়নে ইস্পাত ও লৌহ উৎপন্ন হয়েছে ১২৬ মিলিয়ন টন। ১৯২২ সালের তুলনায় ৪২০ গুণ বেশী উৎপাদিত হয়েছে। ৩ বছরে গ্যাস হয়েছে ২৩০,০০০ মিলিয়ন ডিউবিক মিটার, ১৯২৮ সালের তুলনায় ৭৬০ গুণ বেশী।

রুশ বিপ্লবের সময় সমগ্র সোভিয়েত ইউনিয়নে মোট জনসংখ্যার দুই তৃতীয়াংশ ছিল নিরক্ষর। এখন সেখানে একটিও নিরক্ষর নেই। সবাই লিখতে পড়তে জানেন। নিরক্ষরতার অভিশাপ দূর হয়েছে। ভারতবর্ষে এখনও শতকরা সত্তরজন নিরক্ষর। অর্থাৎ মোট জনসংখ্যার দুই তৃতীয়াংশই নিরক্ষর যা ছিল রুশ বিপ্লবের আগে সেদেশে।

রুশ বিপ্লবের সময়ে কিরঘিজিয়া, তাজিকস্তান ও তুর্কমেনিয়াতে কোনো উচ্চ অথবা মাধ্যমিক বিদ্যালয় ছিল না। বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চ শিক্ষার কোনো ব্যবস্থা ছিলনা বেলোরাশিয়া, উজবেকিস্তান, কাজাকস্তান, আজারবাইজান, লিথুনিয়া মোলাজাভিয়া ও আর্মেনিয়াতে। এই সব রাষ্ট্রে এখন ৮০০ কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়, ৪,৩০০ বিশেষ প্রশিক্ষণ বিদ্যালয় লাখলাখ ছাত্রকে গড়ে তুলছে প্রতি বছরে। তাছাড়া আড়াই হাজার গবেষণা কেন্দ্র এবং রয়েছে প্রতিটি অঙ্গ-রাষ্ট্র একটি করে বিজ্ঞান আকাডেমি।

রুশ বিপ্লবের পর বহু ভাষায় সাহিত্য গড়ে উঠেছে, উননব্বইটি ভাষায় তখন সাহিত্য রচিত হচ্ছে। এশিয় রাষ্ট্রগুলিতে ১৯৬৫ সালে তাদের আঞ্চলিক ভাষায় সংবাদপত্র প্রচারের সংখ্যা ছিল ৪০,৫০০,০০০ কপি, ১৯৭০ সালে সে সংখ্যা বৃদ্ধি হয়ে দাঁড়ায় ১:৬, ৭০০,০০০ কপিতে।

সোভিয়েত ইউনিয়নে প্রতি মিনিটে এখন তিন হাজার কপি বই ছাপা হচ্ছে। ১৯৭১ সালে ১০৮ টি ভাষায় বিভিন্ন রকমের বই ছাপা হয়েছিল। এর মধ্যে বাংলা হিন্দির মত বিদেশী ভাষার বইও রয়েছে। গত পাঁচ বছরে সোভিয়েত ইউনিয়নে ৬০০০ মিলিয়ন অর্থাৎ ছ'শ কোটি কপি বই বিক্রি হয়েছে।

ওপরের পরিসংখ্যান বিবৃতি থেকেই সোভিয়েত ইউনিয়নের অগ্রগতির একটা পরিষ্কার চিত্র পাওয়া যাবে। সোভিয়েত ইউনিয়নের অর্ধশতাব্দীর জয়যাত্রা তার ঐক্য ও সংহতিরই জয়যাত্রা।

## সোভিয়েত অঙ্গ রাষ্ট্রগুলোর সংক্ষিপ্ত পরিচয়

আয়তনে বিশ্বের সবচেয়ে বড় রাষ্ট্র সোভিয়েত ইউনিয়ন। পৃথিবীতে এমন কোনো রাষ্ট্র নেই যেখানে এক প্রান্ত থেকে আরেক প্রান্তের ঘড়ির সময়ের তফাৎ ন' ঘণ্টা। ট্রেনে করে মস্কো থেকে ব্লাডিভাস্টক পৌঁছতে লাগে সাত দিন।

সোভিয়েত ইউনিয়নের আয়তন দু'কোটি চব্বিশ লাখ বর্গ কিলোমিটার, লোকসংখ্যা কিন্তু তার আয়তনের তুলনায় অনেক কম, মাত্র চব্বিশ কোটি সতর লাখ বিশ হাজার একশ চৌত্রিশ জন। মোট লোক সংখ্যার ৫৫% জন হচ্ছে রুশ, ২০% জন ইউক্রেনিয়ান এবং বাকি জনসংখ্যা ভিন্ন জাতিদের মধ্যে বণ্টিত।

সোভিয়েত রিপাবলিকগুলোর মধ্যে সব চেয়ে বড় রিপাবলিক হল রাশিয়ান ফেডারেশন, এর আয়তন এক কোটি সত্তর লাখ পঁচাত্তর হাজার বর্গ কিলোমিটার এবং লোকসংখ্যা তের কোটি নব্বই হাজার। রাশিয়ান ফেডারেশনে রয়েছে ষোলটি স্বায়ত্ব শাসিত সোভিয়েত রিপাবলিক, পাঁচটি স্বায়ত্ব শাসিত প্রদেশে, দশটি জাতির ডিসট্রিক্ট। ষাট রকমের বিভিন্ন জাতির বাস রুশ ফেডারেশনে। ইউরোপ ও এশিয়ার অঞ্চল নিয়ে গঠিত হয়েছে রুশ ফেডারেশন। আবহাওয়া তাই বৈচিত্র্যময়। প্রায় সব রকমের খনিজ দ্রব্যে সমৃদ্ধ রুশ ফেডারেশন। যন্ত্র শিল্পে উন্নত বিশ্বের দেশগুলোর মধ্যে অন্যতম। বিশ্ববিখ্যাত মস্কো নগরী হচ্ছে এর রাজধানী এবং সেই সঙ্গে সমগ্র সোভিয়েত ইউনিয়নের ও রাজধানী।

রুশ ফেডারেশানের পরেই আয়তনে দ্বিতীয় বৃহৎ অঙ্গ রাষ্ট্র হচ্ছে কাজাকাস্তান, আয়তনে সাতাশ লাখ পনর হাজার একশ বর্গ কিলোমিটার। এক দিকে ভল্গা আলিতাই পর্বত পর্যন্ত বিস্তির্ণ, আরেক দিকে সাইবেরিয়ার সমতল

ভূমি থেকে মধ্য এশিয়ার মরু অঞ্চল। আলমাআটা হচ্ছে এর রাজধানী। সোভিয়েত ইউনিয়নের যে সব অঙ্গ রাষ্ট্র কৃষিজ উৎপাদনে অগ্রণী কাজাকস্তান তাদের মধ্যে অন্যতম। শিল্পোন্নয়নও হচ্ছে অতি দ্রুত গতিতে। রুশ বিপ্লবের আগে লেখাপড়া জানার সংখ্যা ছিল নগন্য, বর্তমানে সবাই সাক্ষর, দশ হাজার স্কুলে ত্রিশ লাখ ছাত্র-ছাত্রী এবং বিশ্ববিদ্যালয় ও গবেষণা স্তরে রয়েছে চার লাখ ছাত্র। তাছাড়া রয়েছে বিজ্ঞান আকাডেমি এবং কয়েকটা গবেষণাগার।

সোভিয়েত ইউনিয়নের বাল্টিক অঙ্গ-রাষ্ট্রগুলোর মধ্যে সর্ববৃহৎ হচ্ছে লিথুনিয়া, আয়তনে পঁয়ষট্টি হাজার দুশো বর্গ কিলোমিটার, লোকসংখ্যা একত্রিশ লাখ উনত্রিশ হাজার মাত্র। রাজধানী ভিলনিউস এর আশে পাশেই শিল্পাঞ্চল। যন্ত্রপাতির কারখানার জন্য বিখ্যাত, ইলেকট্রনিক যন্ত্র থেকে আরম্ভ করে জাহাজ নির্মাণ সবই হচ্ছে আজকাল সেখানে। ল্যাটভিয়া রিপাবলিকের আয়তন তেষট্টি হাজার সাতশ বর্গ কিলোমিটার। লোকসংখ্যা তেইশ লাখ পঁয়ষট্টি হাজার। রাজধানীর নাম রিগা। এই নামে ছোট ট্রাক তৈরী হয় ওখানে। যন্ত্র-শিল্পের মধ্যে রেডিও এবং ইলেকট্রনিক জিনিষ বিশেষ উল্লেখযোগ্য। সাহিত্য-সংস্কৃতিতে সমৃদ্ধ এই ছোট দেশে বস্ত্র কাঠের কাজ, কাঁচের জিনিষও চিনামাটির জিনিষ ছাড়াও সুগন্ধি আতর ইত্যাদিতে বিশেষ উল্লেখযোগ্য স্থান অধিকার করেছে।

বাল্টিক সমুদ্রোপকূলের উত্তরাঞ্চলের অঙ্গরাষ্ট্রে এস্তোনিয়া রিপাবলিকের জনসংখ্যা তের লাখ সাতান্ন হাজার, লোক সংখ্যার তুলনায় দেশের আয়তন অনেক বড়, পঁয়তাল্লিশ হাজার বর্গ কিলোমিটার। রাজধানী তালিন আবার বিখ্যাত বন্দর। দেশ-বিদেশের জাহাজ ভেড়ে এই বন্দরে। বাল্টিক অঙ্গরাস্ট্রগুলোতে মাছ ধরার ব্যবসা ফেঁপে উঠছে। তালিনের উপকণ্ঠে গড়ে উঠেছে বিভিন্ন শিল্প, মাছ টিনের কৌটয় করে চালান যাচ্ছে দেশ-বিদেশে। অজস্র কাঠ এই রাজ্যে। তাই গড়ে উঠেছে কাগজ তৈরীর কারখানা। শিল্প-সংস্কৃতিতে সমৃদ্ধ এস্তোনিয়ার বিজ্ঞান আকাডেমি সুনাম অর্জন করেছে।

সোভিয়েতে ইউনিয়নের পশ্চিমে অবস্থিত বেলোরাশিয়া, আয়তন দু লাখ সাত হাজার ছ শ বর্গকিলোমিটার, লোক সংখ্যা নব্বই লাখ তিন হাজার মাত্র। রাজধানী মস্কো মিন্স্ক। অধিকাংশ কল-কারখানা মিন্স্কের উপকণ্ঠে। এককালে পিছিয়ে পড়া এই অঙ্গ-রাষ্ট্র এখন সোভিয়েত ইউনিয়নের ভারী

যন্ত্র-শিল্প তৈরী করছে, বেলোরাশিয়ায় নির্মিত ট্রাক-ট্র্যাক্টর এখন বিশ্বে নাম কিনেছে, নানান ধরনের যন্ত্রপাতি নির্মাণ ছাড়াও রাসায়নিক দ্রব্য তৈরী হচ্ছে।

ককেশাশ পর্বতমালার দক্ষিণ-পশ্চিমে অবস্থিত আজার বাইজান রিপাবলিকের আয়তন ছিয়াশি হাজার বর্গ কিলোমিটার। আজার বাইজান রিপাবলিকে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে নাখিচেভান এবং নাগোরনি স্বায়ত্বশাসিত দুটো রাজ্য। লোকসংখ্যা মাত্র একান্ন লাখ এগার হাজার। আজার বাইজানকে পেট্রলের রাজ্য বলা উচিত, সোভিয়েত ইউনিয়নে সবচেয়ে বেশী পেট্রল পাওয়া যায় এই রাজ্যে। রাজধানীর নাম বাকু। বাকু শুধু আজার বাইজানের রাজধানী নয় সোভিয়েত ইউনিয়নের পেট্রল রাজ্যের রাজধানী। পেট্রল ছাড়াও বিভিন্ন ধাতুর কারখানা রয়েছে, গড়ে উঠেছে রসায়ন শিল্প, উৎপন্ন করছে জল বিদ্যুৎ।

লোকসংখ্যায় দ্বিতীয় বৃহৎ রাষ্ট্র ইউক্রেনিয়ার আয়তন ছ'লাখ তিন হাজার সাতশ বর্গ কিলোমিটার এবং লোক সংখ্যা চার কোটি একাত্তর লাখ ছত্রিশ হাজার। ইউক্রেনিয়ার রাজধানীর নাম কিয়েভ। শিক্ষায়-দীক্ষায়-সংস্কৃতিতে ইউক্রেনিয়া অগ্রণী দেশ। দশ হাজার লোকের মধ্যে একশ সত্তর জনই বিশ্ববিদ্যালয় অথবা কোনো গবেষণাগারে কর্মে ব্যস্ত। এই রাজ্যের বিভিন্ন গবেষণা পরিষদে এক লাখের ওপর বৈজ্ঞানিক বর্তমানে কাজ করছেন। রাশিয়ান ফেডারেশনের পরেই ইউক্রেনিয়া এখন যন্ত্র-শিল্পে উন্নত মানের দেশ। লৌহ-ইস্পাত কয়লা ইত্যাদি উৎপাদনে বিশ্বের উন্নত দেশের মধ্যে ইউক্রেনিয়া স্থান তাদের পাশেই।

সোভিয়েত ইউনিয়নের অনেক ছোট নামের মধ্যে জর্জিয়া অন্যতম। জর্জিয়ার আয়তন মাত্র উনসত্তর হাজার সাতশ বর্গ কিলোমিটার, লোকসংখ্যা ছেচল্লিশ লাখ অষ্টআশী হাজার। রাজধানীর নাম তিবি্লিশি। ওখানকার লোকেরা আদর করে ডাকে বিলিশি। জর্জিয়া দেশটি ছোট হতে পারে কিন্তু ইতিহাসে বেশ পুরোনো দেশ। এর ঐতিহ্য অনেক কালের। রুশ বিপ্লবের পর থেকে আজ পর্যন্ত শিক্ষার প্রসার বেড়েছে সাংঘাতিক ভাবে। ফলে এদের ডিগ্রী প্রাপ্তদের সংখ্যা সব চেয়ে বেশী। এখানে যন্ত্র শিল্পের যেমন উন্নয়ন হয়েছে তেমনি দ্রাক্ষারস জাত মাদক দ্রব্যের উৎপাদন সব চেয়ে বেশী এবং উৎকৃষ্ট ধরণের।

সোভিয়েত ইউনিয়নের দক্ষিণ পশ্চিমে অবস্থিত মোলদাভিয়া রিপাবলিকের আয়তন তেত্রিশ হাজার সাতাশ বর্গ কিলোমিটার এবং লোকসংখ্যা পঁয়ত্রিশ লাখ বাহাত্তর হাজার। ১৯৪০ সালে সোভিয়েত ইউনিয়নে যোগদান করেছে, রাজধানীর নাম কিশিনেভ। বিগত বত্রিশ বছরে এই রাজ্যে শিল্পোন্নয়ন হয়েছে তেইশ গুণ বেশী, ট্রাক্টরের মতন অনেক ভারি যন্ত্রপাতি নির্মিত হচ্ছে আজকাল। ১৯৪০ সালের তুলনায় তখন বিদ্যুৎ উৎপাদিত হচ্ছে চারশ গুণ বেশী। মোলদাভিয়ার দ্রাক্ষা চাষ ও দ্রাক্ষারস জাত মাদক দ্রব্য সোভিয়েত ইউনিয়নে বিখ্যাত।

মধ্য এশিয়ার দক্ষিণ পূর্বের রাজ্য তাজিকস্তানের আয়তন একলাখ তেতাল্লিশ হাজার একশ বর্গ কিলোমিটার, লোকসংখ্যা মাত্র উনত্রিশ লাখ। তাজিকস্তানের রাজধানীর নাম দুশানবে। সাংস্কৃতিক ইতিহাসে ঐতিহ্যপূর্ণ এই দেশটির সঙ্গে মধ্যযুগে ভারতের সঙ্গে ছিল নিবিড় যোগাযোগ। রুশ বিপ্লবের আগে এই রাজ্যে একটিও কলকারখানা ছিল না। এখন সেখানে তিনশটির বেশী বিভিন্ন শিল্প সংস্থা গড়ে উঠেছে।

সোভিয়েত ইউনিয়নের সর্ব দক্ষিণে অবস্থিত তুর্কমেনিয়া রিপাবলিকের আয়তন চারলাখ অষ্টআশী হাজার একশ বর্গ কিলোমিটার। লোকসংখ্যা একুশ লাখ আটান্ন হাজার। বিপ্লবের আগে তুর্কমেনিয়ায় জনগণ যাযাবরের মতন জীবন যাপন করত, শিক্ষা-দীক্ষার কোনো নাম গন্ধ ছিলনা। এখন সেখানে সবাই শিক্ষিত। তাদের এঞ্জিনিয়াররা তিনশটি শিল্প সংস্থায় কাজ করছে। কৃষিতে যখন উদ্বৃত্তের দেশে পরিণত হয়েছে। পেট্রল, গ্যাস এবং রাসায়নিক শিল্প গড়ে উঠছে আশাতীত ভাবে। বিশ্বের সর্ববৃহৎ খাল কারা-কুম তুর্কমেনিয়ার গর্বের বস্তু।

মধ্য এশিয়ার সর্ববৃহৎ রিপাবলিক উজবেকিস্তানের আয়তন চার লাখ উনপঞ্চাশ হাজার ছশ বর্গ কিলোমিটার, লোকসংখ্যা এক কোটি উনিশ লাখ তেষট্টি হাজার। রাজধানীর নাম তাশখন্ত। মধ্য এশিয়ার অন্য সব রিপাবলিকের মধ্যে সবচেয়ে বেশী উন্নত দেশ এই উজবেকিস্তান, বিপ্লবের আগে এই দেশের' পাঁচ ভাগের তিন ভাগই ছিল মরুভূমি। এখন জল সেচের ব্যবস্থায় মরুভূমির বুকে ফুটে উঠেছে সোনালী ফসলের হাসি।, বিশ্বের তুলা উৎপাদনকারি দেশগুলোর মধ্যে তৃতীয় স্থান লাভ করেছে উজবেকিস্তান। তাই এখানে রয়েছে অসংখ্য কাপড়ের কল। চাষাবাদ ছাড়াও খনির কাজ

চলছে, সোনা ছাড়াও আরও অনেক অতি প্রয়োজনীয় ধাতব পদার্থ এখানে পাওয়া যায়। গ্যাস যেমন পাওয়া যাচ্ছে তেমনি ইস্পাত ও যন্ত্রশিল্পের কারখানাও গড়ে উঠছে। একা উজবেকিস্তানের বিজ্ঞান আকাডেমির অধীনে চলছে এখন দুশোটা গবেষণা পরিষদ।

সোভিয়েত মধ্য এশিয়ার উত্তর-পশ্চিমে অবস্থিত কিরখিজিয়া রিপাবলিকের আয়তন একলাখ আটানব্বই হাজার পাঁচ'শ এবং লোক সংখ্যা উনত্রিশ লাখ তেত্রিশ হাজার। রাজধানীর নাম ফ্রুঞ্জ। রুশ বিপ্লবের আগে কিরখিজ ভাষায় বর্ণমালা ছিল না, এখন সেখানে সবাই শিক্ষিত এবং রয়েছে নিজেদের বিজ্ঞান আকাডেমি। সেকালে পশুপালন ছাড়া আর কোনো কাজ ছিল না, এখন সেখানে ছোটবড় পাঁচ হাজার শিল্প সংস্থা চলছে তারমধ্যে সাতশটি বৃহৎ কারখানা।

সোভিয়েত ইউনিয়নের দক্ষিণ প্রান্তে আরেকটি ছোট রিপাবলিক আর্মেনিয়ার আয়তন উনত্রিশ হাজার আটশ বর্গ কিলোমিটার এবং লোকসংখ্যা চব্বিশ লাখ তিরানব্বুই হাজার। রাজধানার নাম এরেভান। প্রাক্‌বিপ্লব যুগে আর্মেনিয়ায় সামান্যই চাষবাস হত এবং তাম্র, মদ ইত্যাদির ব্যবসা চালাত বিদেশী মহাজনরা। বর্তমানে ছ'শ বড় শিল্প সংস্থায় কাজ চলছে, তারমধ্যে রয়েছে ধাতুর কারখানা, রাসায়নিক কারখানা, বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতির কারখানা থেকে আরম্ভ করে খাদ্য দ্রব্যের কারখানা এখন আর্মেনিয়া ছেয়ে ফেলেছে। আর্মেনিয়ার সঙ্গে ভারতের যোগাযোগ ইতিহাসিক, বিশেষ করে কলকাতার সঙ্গে। কলকাতায় আর্মেনিয়ানদের উপস্থিতি আজকের নয়, তিন শ বছরের ও বেশী।

**সমাপ্ত**